ভালোবাসার
রামাদান
ড. আয়িয আল-কারনী

ভালোবাসার রামাদান

ড. আয়িয আল-কারনী

প্রথম প্রকাশ

মে ২০১৯

সমকালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামি টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোনঃ ০১৬১৬-৬২৬-৬৩৬

প্রকাশকের কথা

জাবালে নূর পাহাড়ের পবিত্র গুহাটির নাম 'হেরা'। গুহার মধ্যে ধ্যানমগ্ন জগতের শ্রেষ্ঠ সম্মানিত ব্যক্তিত্ব 'মুহাম্মাদ' ﷺ। একদিন সেই গুহায় সবচেয়ে সম্মানিত ফেরেশতা জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর আগমন ঘটে। সবচেয়ে সম্মানিত ফেরেশতা সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তির কাছে আল্লাহর মহিমান্বিত আসমানী-গ্রন্থ 'আল-কুরআন' নিয়ে আবির্ভূত হন। এই গ্রন্থ সর্বপ্রথম নাযিল হয় পবিত্র রামাদান মাসে। মাসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত মাসে।

রামাদান, বছরের সবচেয়ে সেরা এবং সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মাস। এই মাসেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নাযিল করেছেন আল-কুরআন যা পুরো মানবজাতির জন্য হিদায়াতের রশ্মি। এই রশ্মির ফলে আলোকিত হয়ে ওঠা পথ ধরে মানবজাতি পৌঁছাতে পারবে সাফল্যের চূড়ান্ত শিখরে। এমন আলোকবর্তিকার আবির্ভাব, নাযিল যেই মাসে, সেই মাসটা সবচেয়ে সেরা মাস হিসেবে ভূষিত হবে—এটাই তো স্বাভাবিক।

রামাদান হলো আত্মশুদ্ধির মাস। তাকওয়ার মাস। সবরের মাস। সর্বোপরি নিজেকে পরিশুদ্ধ করার মাস। এই মাসে একজন ব্যক্তি আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ককে একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সালাত, যিকির, দুআ এবং কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে বান্দা চেষ্টা করে আল্লাহর প্রিয় হয়ে উঠতে। এতদিনকার নিজের কৃত পাপ আর গুনাহের সাগর থেকে উঠে আসতে বান্দা এই মৌসুমকে বসন্ত মৌসুম হিসেবে ধরে নেয়। এই মাস হলো রহমত, মাগফিরাত ও নাযাতের মাস। এই মাসেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দিয়ে

জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেন। এই মাসেই অভিশপ্ত শয়তানের পায়ে শিকল পরিয়ে তাকে বন্দী করে রাখা হয়। এই মাসের মধ্যে এমন একটি রাত রয়েছে যে-রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে-রাতের ইবাদাত হাজার মাসের ইবাদাতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এই রাত হলো ক্বদরের রাত। যে-রাতে জিবরীল আলাইহিস সালাম ওহী নিয়ে প্রথম হেরা গুহায় মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

রামাদান মাস হলো বান্দার জন্য গুনাহ মাফ করিয়ে নেওয়ার সেরা সুযোগ। আল্লাহর অধিক প্রিয় হয়ে ওঠার সুবর্ণ সময়। তাই এই মাসের প্রতিটা সময়, প্রতিটা সেকেন্ড, মিনিট এবং ঘণ্টাকে খুব সতর্কতার সাথে, খুব যত্নের সাথে কাটানো উচিত। রামাদান মাসের ফযীলত নিয়ে বাংলাভাষায় বেশ বইপত্র আমরা দেখতে পাই। তবে, খুব আন্তরিকতা এবং যত্নের সাথে, প্রিয় মানুষের মতোন করে রামাদানের হাকীকত, আমল এবং আবশ্যিকতাগুলো গুছিয়ে, বুঝিয়ে বলা আছে—এমন বইপত্র একেবারে হাতেগোনা। এক্ষেত্রে আরব-বিশ্বের প্রখ্যাত দাঈ ড. আয়িয আল-কারনি হাফিজাহুল্লাহ কর্তৃক লিখিত *সালাসূনা দারসান লিস-সয়িমীন* বইটা নিয়ে আমরা কাজ করেছি, আলহামদু লিল্লাহ। বইটাকে *ভালোবাসার রামাদান* নামে বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য অনুবাদ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আমরা আশাবাদী, আমাদের রামাদানগুলোকে আরো সুন্দর, আরো স্বপ্নময় করে তুলতে এই বই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবার রামাদানকে স্বপ্নময় করে তুলুন। রামাদানকে নিয়ে আমরা সবাই বুকের মধ্যে যে স্বপ্ন আঁকছি, তা যেন বাস্তবায়িত হয়—এই প্রত্যাশা নিরন্তর...

প্রকাশক
সমকালীন প্রকাশন।

সম্পাদকের কথা

'রামাদান' শব্দটির ধাতুমূল হলো 'রামদুন'। অর্থ—রৌদ্র-দগ্ধ হওয়া কিংবা আগুনে জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করা।[১] সুতরাং বলা যায়, অনুতাপের উত্তাপে মুমিনের পাপারাশি ভস্মিভূত করে তাকে দয়ার চাদরে জড়িয়ে নেওয়ার চেতনা ও প্রত্যয় 'রামাদান'-এর সামগ্রিক প্রকৃতি ও মৌল দৃষ্টিকোণ থেকে উৎসারিত। আর এই চেতনা ও প্রত্যয় নিছক ভাষা-সৌকর্যের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং জীবনের প্রশস্ত অঙ্গনেও পরিব্যাপ্ত। কারণ, আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসে নবীজি ﷺ বলেন—

❝

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমআ থেকে অপর জুমআ এবং এক রামাদান থেকে আরেক রামাদান—তার মধ্যবর্তী সময়ের (গুনাহের) জন্য কাফফারাস্বরূপ—যদি কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়।[২]

---

[১] *আল-মুনজিদ, আল-কামূসুল মুহীত*

[২] *সহীহ মুসলিম* : ৪৩৮

উল্লেখ্য যে, নবীজি ﷺ রামাদানের এই ক্ষমাগুণ বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং ক্ষমা-লাভের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে উৎসাহিত করেছেন এবং কেউ এতে ব্যর্থ হলে তাকে আগাম ধিক্কার দিয়ে রেখেছেন। বর্ণিত হয়েছে—

❝

وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ

ওই ব্যক্তি অপদস্থ হোক—যে রামাদান পেয়েও নিজের গুনাহ মাফ করাতে পারে না।[১]

আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দয়া হলো ক্ষমার পূর্বশর্ত। কেননা, মানুষ অন্যায়কারীকে তখনই ক্ষমা করতে পারে যখন তার মধ্যে দয়ার উদ্রেক হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি, মৌলিকভাবে রামাদান আমাদের জন্য ক্ষমা ও দয়ার ডালি নিয়ে উপস্থিত হয়।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রামাদানের সামগ্রিক অবদান কি দয়া ও ক্ষমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, না এর বাইরেও রামাদানের ভূমিকা রয়েছে? নিম্নোক্ত হাদীস থেকে আমরা উপর্যুক্ত প্রশ্নের এই উত্তর পাই যে, ক্ষমা ও দয়া রামাদানের মৌলিক উদ্দেশ্য হলেও তার সামগ্রিক অবদান কেবল এ দু'টিতেই সীমিত নয়; বরং রামাদান হলো একটি পাওয়ার হাউস, চেতনার অফুরন্ত উৎস এবং উন্নত ব্যক্তিত্ব গঠনের গুরুত্বপূর্ণ পাঠ। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

❝

وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ، وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ

তোমাদের কেউ যখন সিয়াম রাখে তখন সে যেন অপ্রয়োজনীয় ও অশ্লীল কথাবার্তা না বলে এবং চিৎকার বা হট্টগোল না করে। কেউ যদি তাকে গালাগাল দেয় কিংবা তার সাথে গায়েপড়ে ঝগড়া করতে আসে, তাহলে সে যেন বলে, আমি রোযাদার।[২]

আরবের বিশিষ্ট দা'ঈ, প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং বিদগ্ধ গবেষক ড. আয়িয আল-কারনী রামাদানের এই গুরুত্বপূর্ণ পাঠগুলোই দুই মলাটে সংকলন করেছেন—

---

[১] হাদিসটি ইমাম তিরমিযী ও হাকিম বর্ণনা করেছেন। *সহীহুল জামি* : ৩৫১০

[২] *সহীহ বুখারী* : ১৯০৪, সহীহ মুসলিম : ১১৫১

ثلاثون درساً للصائمين—নামে। লেখক তার অন্যান্য বইয়ের মতো এই বইয়েও ছত্রে ছত্রে শব্দের মালা গেঁথেছেন। বাক্যের সাযুজ্যে শব্দের ঝংকার তুলেছেন এবং কবিতার[১] উপর্যুপুরি উদ্ধৃতি দিয়ে বইটিকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন। সমকালীন প্রকাশন এই মূল্যবান বইটি বাঙালি পাঠকদের হাতে তুলে দিচ্ছে. *ভালোবাসার রামাদান* নামে। রামাদান ও রামাদান-পরবর্তী সময়ের জন্য তার সামনে একটি কর্মসূচি তুলে ধরবে। পাঠক চাইলে এই পাঠগুলোকে জীবনের পার্ট বানিয়ে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সাফল্য নিশ্চিত করতে পারেন। আল্লাহই একমাত্র তাওফীকদাতা।

আকরাম হোসাইন

সম্পাদক, সমকালীন প্রকাশন

[১] অবশ্য সম্পাদনার সময় কবিতার ভাব ও প্রাসঙ্গিকতা বিচার করে অধিকাংশ কবিতাই বাদ দেওয়া হয়েছে।

প্রারম্ভিকা

সকল প্রশংসা রাজাধিরাজ ও পূত-পবিত্র মহান আল্লাহর—যিনি শান্তি ও নিরাপত্তা-বিধায়ক; সকল পুণ্য ও মর্যাদার ধারক; যিনি আমাদের ইসলামের পথে পরিচালিত করেছেন এবং সালাত ও সিয়ামের মতো বিধানাবলির মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত করেছেন।

দরূদ ও সালাম মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি—যিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল এবং সালাত-সিয়াম পালনকারীদের আদর্শ। শান্তি বর্ষিত হোক তার পরিবার-পরিজন, সাহাবী ও সকল তাবিয়ীর ওপর।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি রামাদানে সিয়াম পালনের দিক-নির্দেশনামূলক একটি গ্রন্থ। এতে আমি অপেক্ষাকৃত কার্যকরী আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদীসের সাহায্য নিয়েছি। সাথে কয়েকটি সুমধুর কবিতাংশ ও হৃদয়গ্রাহী বেশকিছু বাণী সন্নিবেশিত করেছি। আশা করি, সৎ ও ধার্মিকশ্রেণি এর দ্বারা উপকৃত হবেন। বিভিন্ন মজলিস ও সফরে এটি বেশ উপকারী বিবেচিত হবে। বক্তা, শিক্ষক ও সহপাঠীদের জন্য সেমিনার, দারস, ও আনন্দভ্রমণে গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশাবাদী। রামাদানে প্রতিটি মসজিদে ইমাম ও খতীবগণ এটিকে তালীমের অংশ হিসেবে রাখতে পারেন।

গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে আমি তিনটি বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি—

এক. সকল নসীহত ও বাণী সরাসরি পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে উপস্থাপন করেছি। এক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীস[১] এবং মিথ্যা ও বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেছি।

দুই. এমন আলোচনা উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি—যা পাঠকের হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের বীজ বপন করবে এবং ঈমানের ভিত্তি স্থাপন করবে। এক্ষেত্রে খুব সচেতনভাবেই বিভিন্ন মাসায়িল ও আহকাম এড়িয়ে গেছি। কারণ, এটা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে ধর্মীয় বিভিন্ন প্রকাশনী কর্তৃক ইসলামী বিধি-বিধানের পর্যাপ্ত পরিমাণ বই প্রকাশিত হয়েছে বটে; কিন্তু ঈমান, ইয়াকীন ও বিশুদ্ধ চিন্তাধারা লাভ করা যায়—এমন বই চাহিদার তুলনায় একেবারে অপ্রতুল। সমাজের চাহিদার এই শূন্যস্থানটি পূরণ করতেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

তিন. গ্রন্থটিতে আমি বিশুদ্ধ ভাষা ও নিখুঁত শব্দচয়নের প্রতি যথাসম্ভব গুরুত্ব দিয়েছি। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর সরল অথচ বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষাশৈলী প্রয়োগের প্রয়াস পেয়েছি। উপদেশ-দানের সহজ প্রক্রিয়া ও সর্বজন-স্বীকৃত রীতি অবলম্বন করেছি।

আশা করছি, বইটিতে পাঠক নতুন কিছু পাবেন এবং সর্বতোভাবে বইটি পাঠকের ভালো লাগবে।

ড. আয়িয আল-কারনী

---

[১] যে-হাদীস সূত্রের বিচারে দুর্বল

সূচিপত্র

Contents

স্বাগতম হে রামাদান!

তালহা ইবনু উদাইদিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ যখন রামাদানের চাঁদ দেখতেন, তখন বলতেন—

“

اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، هِلَالُ رُشْدٍ وَخَيْرٍ

হে আল্লাহ, আমাদের জন্য চাঁদটিকে বরকতময় করুন এবং ঈমান, নিরাপত্তা ও শান্তির বাহনরূপে উদিত করুন। হে নতুন চাঁদ, আল্লাহ তাআলা আমারও রব, তোমারও রব। কল্যাণ ও সুপথের বাহন তুমি।[১]

সর্বোৎকৃষ্ট মাস মাহে রামাদান। এ মাসের প্রতিটি দিন আনন্দের। একমাস দু-মাস নয়; পুরো একটি বছর ঘুরে আগমন ঘটে রামাদানের। এমন দীর্ঘ বিচ্ছেদ ও বিরতির ফলে শোকাকুল হয়ে পড়েন আল্লাহর নেক বান্দাগণ। দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রহর গোনেন তারা। কবে আসবে নতুন চাঁদের আগমনবার্তা...। অবশেষে একদিন আগমন ঘটে রামাদানের। ঘোর কেটে পশ্চিমাকাশে উদিত হয় বহুল প্রতীক্ষিত সেই ‘হিলাল’।এই বরকতময় মেহমানের আগমন ঘটতেই মানুষের হৃদয় আল্লাহমুখী হয়ে যায়। যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয় এবং সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি নেক আমল ও সৎকর্মের আবরণে আচ্ছাদিত করা হয়। অতএব, স্বাগতম তোমায় হে রামাদান!

---

[১] *জামি তিরমিযী* : ৩৪৫১

নবীজির সিয়াম পালন

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, রামাদানে নবীজি ﷺ খুব বেশি পরিমাণে ইবাদাত করতেন। সালাত, সাদাকা, যিকির, তিলাওয়াত, ইতিকাফ ও অন্যান্য ইবাদাতে সর্বোচ্চ সময় দিতেন। প্রতি রাতেই জিবরীল আলাইহিস সালাম-কে কুরআন শোনাতেন। নিজেও তার তিলাওয়াত শুনতেন। সব সময়ই অকাতরে দান করতেন। তবে জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর সাক্ষাতের সময় হলে বদান্যতায় রহমতের বায়ুকেও ছাড়িয়ে যেতেন তিনি। তার এই অনন্য দান ও বদান্যতা সম্পর্কে একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

"

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

তিনি সব সময়ই ছিলেন সর্বাপেক্ষা অধিক দানশীল। তবে রামাদানে বদান্যতায় তিনি নিজেকেও ছাড়িয়ে যেতেন।[১]

এছাড়াও নবীজি ﷺ অন্যান্য মাসের তুলনায় রামাদানকে অধিক গুরুত্ব দিতেন। এ মাসটিকে শুধুই ইবাদাতের জন্য বরাদ্দ রাখতেন। অনেক সময় ইফতার-সাহরী না খেয়ে একটানা সিয়াম পালন করতেন। রাত-দিন একাকার করে মহান আল্লাহর ইবাদাতে নিমগ্ন থাকতেন। তবে সাহাবীদের এভাবে সিয়াম পালন করতে বারণ করতেন। সাহাবীগণ

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৬

নিবেদন করতেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি যে একনাগাড়ে সিয়াম পালন করেন? তিনি বলতেন, 'আমি তো তোমাদের মতো নই। আমি যখন আমার রবের উদ্দেশ্যে রাত্রিযাপন করি তখন তিনিই আমার পানাহারের[১] ব্যবস্থা করেন।'[২]

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন লাগাতার সিয়াম পালন করতেন তখন তার সামনে সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হতো, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার নতুন নতুন দুআর উন্মোচিত হতো, রিসালাতের আলোক-ঝরনায় তার জ্ঞানসত্তা আলোকিত হতো এবং নবুওয়াতের অমিয় সুধায় তার ব্যক্তিসত্তা পরিতৃপ্ত হতো। উপর্যুক্ত হাদীসে এই পরিতৃপ্তিকেই পানাহার বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অবশ্য এর পেছনে যৌক্তিক কারণও আছে। কেননা, অব্যাহত সিয়ামের মধ্য দিয়ে নবী ﷺ মহান রবের নিকট-সান্নিধ্য অনুভব করতেন। প্রেমাস্পদের স্মরণে হৃদয় জুড়াতেন। তখন সঙ্গাত কারণেই পার্থিব জগৎ ও পানাহারের কথা বেমালুম ভুলে যেতেন।

নবীজি ﷺ ছিলেন সবচেয়ে বড় আবিদ—তিনি সর্বদা মহান আল্লাহর ইবাদাত করতেন। তাঁর স্মরণে চিত্ত ও জিহ্বা সিক্ত রাখতেন। রামাদানকে সালাত, সিয়াম, যিকির, তিলাওয়াত ও অন্যান্য ইবাদাতের ভর মৌসুম মনে করতেন। রাতভর সালাতে দাঁড়িয়ে মহান রবের সাথে অন্তরাত্মার সম্পর্ক স্থাপনে মনোযোগি হতেন। নিবেদিত প্রাণ হয়ে তাঁর কাছে দয়া, অনুগ্রহ, সাহায্য, সফলতা ও বিজয়ের মিনতি জানাতেন। লম্বা লম্বা সূরা পড়তেন। রুকু-সিজদায় দীর্ঘসময় কাটিয়ে দিতেন। এরপরও তাঁর হৃদয়ে ইবাদাতের প্রতি এক প্রকার ক্ষুধা ও অতৃপ্তি কাজ করত।

নৈশকালীন ইবাদাত ছিল তাঁর চোখের শীতলতা, বুকের বল এবং জীবনের একমাত্র অবলম্বন। মহান আল্লাহ তাকে সম্বোধন করে বলেন—

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

হে বস্ত্রাবৃত, আপনি রাতজেগে সালাত আদায় করুন—তবে কিছু অংশ ব্যতীত।[৩]

---

[১] এখানে পানাহার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সর্বোচ্চ পর্যায়ের আত্মিক শক্তি—যে-শক্তি অর্জিত হলে ইবাদাতে ক্লান্তি অনুভূত হয় না এবং শারীরিক দুর্বলতাও দেখা দেয় না। মহান আল্লাহ কেবল তাঁর প্রিয় রাসূলকেই এই পর্যায়ের আত্মিক শক্তি দান করেছিলেন। অন্য কাউকে দান করেননি। তাই অন্যদের তিনি এধরনের সাধনায় ব্রতী হতে নিষেধ করেছেন।

[২] *সহীহ বুখারী* : ১৯৬৭; *সহীহ মুসলিম* : ১১০৩

[৩] সূরা মুযযাম্মিল, আয়াত : ১-২

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করুন। এটা আপনার অতিরিক্ত দায়িত্ব। শীঘ্রই আপনার পালনকর্তা আপনাকে উন্নীত করবেন প্রশংসিত স্থানে।[১]

আর দিনের বেলায় নবীজি ﷺ দাওয়াত, জিহাদ, আত্মশুদ্ধি, নসীহত, ফতোয়াপ্রদান ও মানুষের সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত থাকতেন।

রামাদানে নবীজির কতিপয় সুন্নাহ

- নবীজি ﷺ সরাসরি চাঁদ না দেখে অথবা নির্ভরযোগ্য কারও সাক্ষ্য না পেলে রামাদানের সিয়াম পালন শুরু করতেন না।
- নবীজি ﷺ সাহরী খেতে পছন্দ করতেন। অন্যদেরও সাহরী খেতে উৎসাহিত করতেন। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসে তিনি বলেন—

“

تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

তোমরা সাহরী খাও; কারণ, তাতে বিরাট বরকত রয়েছে।[২]

সাহরীর সময় অত্যন্ত বরকতময়। কেননা, রাতের শেষ তৃতীয়াংশ দুআ ও ইস্তিগফারের সময়; অধিকন্তু এসময়ে মহান আল্লাহ নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন। বান্দাদের ডেকে ডেকে তাদের প্রয়োজন জিজ্ঞেস করেন এবং প্রয়োজন-পূরণের আশ্বাস দেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করে।[৩]

---

[১] সূরা বানী-ইসরাঈল, আয়াত : ৭৯

[২] *সহীহ বুখারী* : ১৯২৩

[৩] সূরা যারিয়াত, আয়াত : ১৮

মহান আল্লাহ আরও বলেন—

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ

তারা ধৈর্যধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ সম্পাদনকারী, সৎপথে ব্যয়কারী এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।[১]

এছাড়াও সাহরী সিয়ামপালনে অত্যন্ত সহায়ক। এর দ্বারা শারীরিক ও আত্মিক শক্তি লাভ করা যায়; অধিকন্তু এতে আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামত তাঁরই ইবাদাতের কাজে ব্যয়িত হয়।

- নবীজি ﷺ সূর্যাস্তের পর দ্রুত ইফতারে করতেন। সূর্যাস্ত নিশ্চিত হওয়ার পর অন্যদেরও দ্রুত ইফতারে উৎসাহিত করতেন। তাজা বা শুকনো খেজুর দিয়ে ইফতার শুরু করতেন। খেজুর না পেলে পানি দিয়ে। কারণ, খালি পেটে মিষ্টিদ্রব্য পাকস্থলীর জন্য অত্যন্ত উপকারী। সুতরাং, সিয়াম পালনের পর সারা দিনের ক্ষুধা নিবারণে উত্তম খাবার হচ্ছে খেজুর ও মিষ্টিদ্রব্য।
- ইফতারের পূর্বমুহূর্তে নবীজি ﷺ দুআয় মগ্ন হতেন। সহীহ সূত্রে আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন—

“

ثلاثة لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ العَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ

তিন ব্যক্তির দুআ বৃথা যায় না—এক. ন্যায়পরায়ণ বাদশার দুআ। দুই. ইফতারের সময় সিয়াম পালনকারীর দুআ। তিন. মাযলুম তথা নির্যাতিত ব্যক্তির দুআ। এই দুআ সরাসরি আসমানে পৌঁছে যায়। এর জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং মহান আল্লাহ অভয় দিয়ে বলেন, আমার বড়ত্বের কসম, আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব—যদিও একটু বিলম্ব হয়।[২]

হাদীসে আরও এসেছে—

[১] সূরা ইমরান, আয়াত : ১৭
[২] *জামি তিরমিযী* : ২৫২৫

إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ

ইফতারের পূর্বমুহূর্তে সিয়াম পালনকারীর দুআ ব্যর্থ হয় না।[১]

উল্লেখ্য যে, ইফতারের সময় নবীজি ﷺ দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কল্যাণ ও সফলতার জন্য দুআ করতেন।

■ নবীজি ﷺ মাগরীবের সালাত আদায়ের পূর্বে-ই ইফতার করতেন। তিনি বলেন—

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

যখন পূর্বদিক হতে সূর্য উদিত হয়ে পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যায়, তখনই সিয়াম পালনকারীর ইফতারের সময়।[২]

■ রামাদান মাসে সফর অবস্থায় নবীজি ﷺ কখনো সিয়াম রাখতেন, আবার কখনো বিরত থাকতেন। সফর অবস্থায় সাহাবীদেরও তিনি সিয়াম রাখা ও না রাখার ইচ্ছাধিকার দিয়েছেন।[৩]

■ সিয়াম পালন অবস্থায় শত্রুর মুখোমুখি হতে হলে নবীজি ﷺ সবাইকে সিয়াম ভেঙে ফেলার আদেশ করতেন। কারণ, যুদ্ধের ময়দানে আত্মিক ও সামরিক শক্তির পাশাপাশি শারীরিকশক্তিও প্রয়োজন।[৪]

উল্লেখ্য যে, রামাদান মাসে নবীজি ﷺ ছোট-বড় বেশ কয়েকটি যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেছেন। তবে সিয়াম ভঙ্গ করেছেন মাত্র দুটি যুদ্ধে। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ এমনটিই বর্ণনা করেছেন। রামাদানে পরিচালিত যুদ্ধের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'বদর-যুদ্ধ'। এই যুদ্ধে আল্লাহ তাকে অভূতপূর্ব বিজয় দান করেন—যা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

---

[১] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৭৫৩

[২] *সহীহ বুখারী* : ১৯৫৪

[৩] *সহীহ বুখারী* : ১৯৪৩, ১৯৪৫ ; *সহীহ মুসলিম* : ১১২১, ১১২২

[৪] *সহীহ মুসলিম* : ১১২০

কতটুকু দূরত্বের সফরে বের হলে সিয়াম ভঙ্গ করা যাবে, তার সুস্পষ্ট বর্ণনা সরাসরি রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে পাওয়া যায় না। তবে প্রসিদ্ধ মতানুসারে যে-ব্যক্তি ৪৮ মাইল তথা ৭৭ কিলোমিটার ভ্রমণের উদ্দেশ্যে নিজের বাসস্থান ত্যাগ করে, তার জন্য সিয়াম ভঙ্গ করার এবং না রাখার অনুমতি রয়েছে। তবে কষ্ট সহনীয় পর্যায়ের হলে সিয়াম পালন করাই উত্তম।[১]

- রামাদান মাসে গোসল ফরয অবস্থায় যদি সুবহে সাদিক হয়ে যেত, তবে রাসূল ﷺ গোসল করে সিয়াম পালন শুরু করতেন। সিয়াম অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করার বর্ণনাও পাওয়া যায়। তবে আমাদের জন্য এমনটি না করাই শ্রেয়। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের মতো নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি আমাদের নেই। সিয়াম অবস্থায় গড়গড়া করে কুলি করা যেমন অনুচিত এবং সিয়ামের জন্য ক্ষতিকর, তদ্রূপ স্ত্রীকে চুম্বন করাও অনুচিত এবং ক্ষতিকর।[২]

- কোনো ব্যক্তি সিয়াম অবস্থায় ভুলক্রমে পানাহার করলে নবীজি ﷺ তার ওপর কাযার বিধান দেননি। কেউ এমনটা করলে তিনি বলতেন, তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পানাহার করানো হয়েছে।[৩]

সিয়াম ভঙ্গের কারণ হিসেবে হাদীসে সরাসরি যে-সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলো হলো—খাওয়া, পান করা এবং হিজামা[৪] ও বমি করা। এছাড়া পবিত্র কুরআনে স্ত্রী সহবাসকেও সিয়াম ভঙ্গের অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

- রামাদানের শেষ দশকে নবীজি ﷺ ইতিকাফ করতেন।[৫] দুনিয়ার যাবতীয় ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে সঁপে দিতেন। অন্তরচক্ষু দিয়ে উর্ধ্বলোক পরিদর্শন করতেন। এজন্য রামাদানের শেষ দশকে তিনি মানুষের সাক্ষাৎ একেবারেই কমিয়ে দিতেন। রবের প্রতি একাগ্রতা ও

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৪; *হিদায়া* : ১/২২১; *জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া* : ১/২০

[২] *ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব* : ১৬/২৩৭

[৩] *সহীহ বুখারী* : ১৯৩৩; *সহীহ মুসলিম* : ১১১৫

[৪] হানাফী মাযহাব অনুসারে হিজামা করলে সিয়ামের কোনো ক্ষতি হয় না। তবে হিজামার কারণে যদি অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের আশংকা থাকে এবং সেকারণে সিয়াম ভেঙে ফেলার মতো দুর্বলতা দেখা দেওয়ার আশংকা থাকে তবে সিয়াম অবস্থায় হিজামা করার অনুমতি নেই।

[৫] *সহীহ বুখারী* : ২০২৬; *সহীহ মুসলিম* : ১১৭১

Contents

আত্মনিবেদন বাড়িয়ে দিতেন। কায়মনোবাক্যে তাঁর দরবারে মিনতি জানাতেন। মানুষের হিদায়াতের জন্য দুআ করতেন। একমনে তাঁর নাম ও গুণাবলির ধ্যান করতেন। সৃষ্টিজগতের অনন্য নিদর্শন নিয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হতেন। বিধাতার অপরূপ সৃষ্টি-কুশলতায় হারিয়ে যেতেন।

এককথায়, নবীজি ﷺ মহান আল্লাহর সম্যক পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হৃদয়ের গভীরে সর্বোচ্চ মাত্রায় ইলমের নূর ধারণ করেছিলেন এবং মরিচীকাময় এই দুনিয়ার তুচ্ছতা পরিপূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এজন্য তিনি আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করতেন। তাঁর ওপর সর্বাপেক্ষা বেশি ভরসা করতেন এবং তাঁর জন্য সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করতেন।

সিয়ামের বিধান কেন?

রামাদানে সিয়ামের বিধানের পেছনে বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য রয়েছে। কুরআন এবং হাদীসে কেবল মৌলিক উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলোর কিছু আমাদের যুক্তিগ্রাহ্য আর কিছু যুক্তি-ঊর্ধ্ব। কুরআনের ভাষ্যমতে সিয়াম হচ্ছে তাকওয়া, আল্লাহভীতি ও তার নৈকট্যলাভের গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম। কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর—যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো।[১]

হাদীসের ভাষায় সিয়াম প্রবৃত্তি দমন করে, দৃষ্টিকে অবনত রাখে, আর অন্তরকে করে পরিশুদ্ধ। বর্ণিত হয়েছে—

“

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৩

হে যুব সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে। কেননা, বিয়ে দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে। আর যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন সিয়াম পালন করে। কেননা, সিয়াম তার যৌনতাকে দমন করবে।[১]

এছাড়াও সিয়ামের আরও কিছু তাৎপর্য রয়েছে। যেমন—

এক. সিয়াম পালন করলে খাদ্য ও রক্তনালি সংকীর্ণ হয়, ফলে দেহে শয়তানের চলাচল রোধ হয় এবং সিয়াম পালনকারী শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়।

দুই. সিয়াম আমাদের নিঃস্ব, অসহায়, অভাবী ও অনাহারীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দারিদ্র্য-পীড়িত যে-পরিবার একমুঠো খাবারের জন্য দিনভর সংগ্রাম করে রাতের বেলা খেয়ে-না-খেয়ে শুয়ে পড়ে—রাস্তার ধারে অথবা হোটেলের সামনের সরু গলিটায়—সন্ধ্যেবেলা ইফতার মুখে তুলতেই সিয়ামের কল্যাণে তাদের কথা মনে পড়ে। চোখের কোণে দু'ফোঁটা অশ্রু জমে। হৃদয়ের গভীরে তাদের পাশে দাঁড়ানোর প্রেরণা জাগে।

তিন. সিয়াম হচ্ছে আত্মার শুদ্ধি ও সমৃদ্ধির ঐশ্বরিক ব্যবস্থা। যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে।

চার. সিয়াম হচ্ছে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার একান্ত গোপনীয় একটি বিষয়। সালাত, যাকাত, হজ—এসব প্রকাশ্য ইবাদাত। এসকল ইবাদাত করলেও মানুষ বুঝতে পারে; না করলেও বুঝতে পারে। অনেক সময় মানুষকে দেখানোর জন্যও এগুলো করা হয়ে থাকে; কিন্তু সিয়ামের বিষয়টি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কারও মৌখিক স্বীকারোক্তি ব্যতীত বোঝার উপায় নেই যে, সে সিয়াম পালন করছে কি না? এটা জানেন শুধু আল্লাহ। কাজেই কারও সিয়াম পালন করার অর্থ হচ্ছে সে একান্ত নিভৃতেও মহান আল্লাহকে ভয় করে। সিয়াম যেহেতু একান্তই আল্লাহর, সেহেতু এর পুরস্কারও স্বয়ং আল্লাহ-ই দেবেন। একটি হাদীসে বলা হয়েছে—

“

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللهُ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৫০৬৬; *সহীহ মুসলিম* : ৩২৬৮

Contents

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, 'সিয়াম ব্যতীত আদম-সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য; কিন্তু সিয়াম শুধুই আমার জন্য। তাই আমি স্বয়ং এর প্রতিদান দেব।'[১]

সালাফগণ রামাদান মাসের গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রতিটি মুহূর্ত সর্বোচ্চ কাজে লাগাতেন। এই মাসকে নেকী লাভের মহা সুযোগ হিসেবে গণ্য করতেন এবং রাত্রিজাগরণ, সালাত আদায়, যিকির, তিলাওয়াত, দাওয়াত, নসীহত ও ইলম শিক্ষাদানের মধ্য দিয়েই এই মাসটি যাপন করতেন।

সিয়াম তাদের নয়ন জুড়াত। হৃদয়ে প্রসন্নতা এনে দিত। আত্মার খোরাক জোগাত। চিন্তাকে প্রসারিত করত এবং চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করত। তাই সিয়াম পালনে তারা স্বর্গীয় আত্মপ্রশান্তি অনুভব করতেন।

জানা যায় যে, সালাফগণ এই মাসে কুরআন নিয়ে মসজিদে বসে পড়তেন। তিলাওয়াত করতেন আর অঝোরে কাঁদতেন। সকল প্রকার গুনাহের কাজ থেকে জবান ও চক্ষুর হিফাযত করতেন।

পাঁচ. রামাদানে সিয়াম পালনের মাধ্যমে মুসলিম ভাইদের মাঝে ঐক্য তৈরি হয়। একসাথে সিয়াম পালন ও অনাহার, অতঃপর একই সময়ে ইফতার ও খাবার গ্রহণের ফলে সবার মাঝে এক ধরনের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে ওঠে। অন্তরে সাম্য ও সহমর্মিতাবোধ জেগে ওঠে।

ছয়. রামাদান মাস বাকি এগারো মাসের যাবতীয় পাপাচারের ক্ষমা ও কাফফারাস্বরূপ। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসে নবীজি বলেন—

“

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমআ থেকে অপর জুমআ এবং এক রামাদান থেকে আরেক রামাদান—তার মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফফারাস্বরূপ—যদি কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়।[২]

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ১৯০৪, *সহীহ মুসলিম* : ১১৫১

[২] *সহীহ মুসলিম* : ৪৩৮

সাত. সিয়াম মানুষের পাকস্থলী ও রক্ত পরিষ্কার করে। খাদ্য-সংক্রান্ত জটিল সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি শারীরিক সক্ষমতা ও পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি করে।

আট. সিয়ামের ফলে হৃদয় বিগলিত হয়। গুনাহের চাহিদা ও কুপ্রবৃত্তি লোপ পায়। সুকুমারবৃত্তি জাগ্রত হয়। এভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা সহজ হয়। ফলে রামাদানে অন্য সময়ের তুলনায় দুআ একটু বেশিই কবুল হয়।

নয়. আল্লাহর হুকুমে সারা দিন পানাহার থেকে বিরত থাকার ফলে আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের যোগ্যতা তৈরি হয়। একমাত্র তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পানাহার ও সহবাস বর্জন এবং সকল প্রকার কুপ্রবৃত্তি উপেক্ষা করার গৌরবময় সৌভাগ্য অর্জিত হয়।

দশ. অনৈতিক চাহিদা ও মনোবাসনা চরিতার্থ না করে সিয়ামের ওপর অটল থাকার ফলে ধৈর্য ও সহনশীলতার মতো মহৎ গুণ অর্জিত হয় এবং তা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। একটি হাদীসে এসেছে—

“

وَاذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ، وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ

তোমাদের কেউ যখন সিয়াম রাখে তখন সে যেন অপ্রয়োজনীয় ও অশ্লীল কথাবার্তা না বলে এবং চিৎকার বা হট্টগোল না করে। কেউ যদি তাকে গালাগাল দেয় কিংবা তার সাথে গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে আসে, তখন সে যেন বলে, আমি রোজাদার।[১]

এভাবে সিয়াম পালনের ফলে মানুষের সংযম, সহনশীলতা ও ক্রোধ দমনের শক্তি বৃদ্ধি পায়। ধৈর্যধারণ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

এগারো. সিয়াম হচ্ছে প্রবৃত্তির জন্য একটি পরীক্ষা। কারণ, সিয়ামের মধ্য দিয়ে প্রবৃত্তিকে দিনভর অনাহারী রেখে আল্লাহর পথে সংগ্রাম ও সাধনার অনুশীলন করানো হয়।

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ১৯০৪; *সহীহ মুসলিম* : ১১৫১

Contents

পবিত্র কুরআনের ভাষ্যমতে আল্লাহর সৈনিক 'তালুত' যখন 'জালুত'[১]-এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের উদ্দেশ্যে বের হন, তখন যাত্রাপথে তার সৈন্যদের সমুদ্র হতে পানি পান করতে বারণ করা হয়। কঠিন পিপাসার মুহূর্তে যা ছিল তাদের জন্য অনেক বড় পরীক্ষা। তালুত সবাইকে লক্ষ্য করে বলেন—

إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের একটি নদী দ্বারা পরীক্ষা করবেন। অতএব, যে তার পানি পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়। আর যে তার স্বাদ গ্রহণ করবে না, নিশ্চয়ই সে আমার দলভুক্ত; কিন্তু যে তার হাত দিয়ে এক আঁজলা পরিমাণ খাবে, তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না।[২]

অতঃপর যারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, আল্লাহ তাদের বিজয় দান করেন এবং ইহকাল ও পরকালে তাদের জন্য উত্তম বিনিময় নিশ্চিত করেন।

সিয়াম পালনের আরও অনেক তাৎপর্য থাকতে পারে, তবে উপর্যুক্ত তাৎপর্যগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞ।

---

[১] তালুত (যাকে বাইবেলে Saul বলা হয়েছে) ছিলেন সম্মানিত নবী শাময়ীল আলাইহিস সালাম কর্তৃক নির্বাচিত বনী ইসরাঈলের একজন বাদশাহ। আর শাময়ীল আলাইহিস সালাম ছিলেন নবী দাউদ আলাইহিস সালামের বাল্যকালে বনী ইসরাঈলের নিকট আল্লাহর দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্বে থাকা একজন সম্মানিত নবী । তৎকালীন বনী ইসরাঈল অত্যধিক পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়লে আল্লাহ তাআলা নবী শাময়ীল আলাইহিস সালামকে বনী ইসরাঈলের সংশোধনের জন্য তাদের নিকট প্রেরণ করেন; কিন্তু তারা আল্লাহর নবীকে মানছিল না। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর 'আমালিকা' নামক গোত্রের এক অত্যাচারী বাদশাহকে চাপিয়ে দিলেন। যে অনেক শক্তিশালী ছিল। সে যখন বনী ইসরাঈলের ওপর নানা রকম অত্যাচার চালাতে লাগল, তখন বনী ইসরাঈলের লোকেরা নবী শাময়ীল আলাইহিস সালামের কাছে এসে অনুরোধ করল, আপনি যদি সত্যিকার নবী হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের জন্য এমন একজন শক্তিশালী বাদশাহ নির্বাচন করে দেন, যার নেতৃত্বে আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি। তখন শাময়ীল আলাইহিস সালাম তালুত নামের এক ব্যবসায়ীকে তাদের বাদশাহ নির্বাচিত করেন। আর 'আমালিকা' গোত্রের সেই অত্যাচারী বাদশাহর নাম ছিল জালুত (যাকে বাইবেলে Goliath বলা হয়েছে) । যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন নবী-নির্বাচিত বাদশাহ তালুত। সূত্র : সূরা বাকারা'র ২৫১ নাম্বার আয়াতের বিভিন্ন তাফসীর অবলম্বনে।

[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৪৯

Contents

কুরআনে কারীম ও রামাদানের সম্পর্ক

রামাদান হচ্ছে বরকতময় মাস। পবিত্র কুরআনের সাথে এই মাসের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

রামাদান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং সত্যের সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্যকারীরূপে।[১]

এই মাসেই পবিত্র কুরআন লওহে মাহফুয থেকে সপ্তম আসমানে অবতীর্ণ হয়। এজন্যও রামাদান অত্যন্ত দামি। শুধু রামাদান কেন? কুরআনের সাথে যার সম্পর্ক যত বেশি হবে, সে তত বেশি দামি হবে। এজন্যই রামাদানের প্রতি রাতে নবীজি ﷺ ও জিবরীল আলাইহিস সালাম পরস্পরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। কুরআনের প্রতিটি শব্দ, বাক্য ও বাণী নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করতেন এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এক কথায়, কুরআনের মধুময় বাণীর শ্যামল ভূমিতে তারা হারিয়ে যেতেন।

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৫

সিয়াম ও তিলাওয়াত উভয়টি একসঙ্গো চালিয়ে গেলে সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির হৃদয়ে রামাদানের পাশাপাশি কুরআনের প্রতিও ভালোবাসা তৈরি হয়। বরকতময় এই গ্রন্থের সান্নিধ্যে কাটে তার রামাদান। মহান আল্লাহ বলেন—

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

এটি একটি বরকতময় কিতাব—যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে।[১]

তিনি আরও বলেন—

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআনের মর্ম-বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?[২]

পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে—

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? পক্ষান্তরে যদি তা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকারও পক্ষ থেকে হতো, তবে অবশ্যই তারা এতে অনেক বৈপরিত্য দেখতে পেত।[৩]

সিয়াম অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করলে হৃদয়ের গভীরে অপার্থিব স্বাদ অনুভূত হয়। ইবাদাতে অনিঃশেষ প্রেরণা জাগে। চিন্তা ও মনোজগতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। হৃদয় মহান রবের প্রতি ভালবাসায় সিক্ত হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসে সুরভি ছড়িয়ে পড়ে এবং তিলাওয়াতের মৃদুমন্দ গুঞ্জনে দেহ-মনে শিহরন জাগে।

---

[১] সূরা সা-দ, আয়াত : ২৯

[২] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ২৪

[৩] সূরা নিসা, আয়াত : ৮২

এছাড়াও রামাদানে কুরআন তিলাওয়াত করলে কুরআন নাযিলের প্রেক্ষাপট, সংকলনের ইতিহাস, তাফসীরকারকদের ব্যাখ্যা এবং কুরআনের প্রতি সালাফদের গুরুত্বদানের ব্যাপারগুলো চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে। অধিকন্তু কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে—

এক. আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন—

“

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ

তোমরা কুরআন পাঠ করো। কেননা, এই কুরআন কিয়ামতের ময়দানে তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশকারী হবে।[১]

দুই. উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন—

“

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে কুরআনে কারীম নিজে শেখে এবং অন্যকে শেখায়।[২]

তিন. আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন—

“

اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ ، وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا

তোমরা দু'টি পুষ্প পাঠ করো, যথা সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান। কারণ, এ দু'টি সূরা কিয়ামতের দিন মেঘমালার মতো অথবা দুই দল পাখির ঝাঁকের মতো সারিবদ্ধভাবে উড়বে। এরা উভয়ে পাঠকের পক্ষ হয়ে আল্লাহর সম্মুখে কথা বলবে।[৩]

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ১৩৯০

[২] *সহীহ বুখারী* : ৪৭৩৯

[৩] *সহীহ মুসলিম* : ১৩৯০

চার. আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন—

"

الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ

আল কুরআনে দক্ষ ও পণ্ডিত ব্যক্তি সম্মানিত ও পুণ্যবান ফিরিশতাদের সঙ্গে থাকবে। আর যে ব্যক্তি আটকে আটকে তিলাওয়াত করে এবং তার জন্য এটা কষ্টকর হয়, তবে তার জন্য দুটি প্রতিদান রয়েছে। (প্রথমটি তিলাওয়াতের প্রতিদান, দ্বিতীয়টি কষ্টের প্রতিদান।)[১]

রামাদান এলে সালাফগণ সব সময় কুরআন সাথে রাখতেন। ঘরে, বাইরে, সফরে ও যাত্রাবিরতিতে—সর্বাবস্থায় একমনে তিলাওয়াত করতেন।

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে জানা যায় যে, রামাদান এলে তিনি দারস, ফতোয়া, মজলিস—সব কিছু বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কুরআন নিয়ে বসে পড়তেন। তিনি বলতেন, 'এই মাস হচ্ছে কুরআনের মাস।'

রামাদানে সালাফদের ঘর থেকে সব সময় তিলাওয়াতের গুনগুন শব্দ ভেসে আসত। কুরআনের সুমধুর কলরবে মুখরিত হতো চারিদিক। প্রতিটি ঘর যেন কুরআনের আলোয় ছেয়ে যেত। সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠত প্রতিটি আঙিনা।

তারা খুব ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করতেন। কোথাও বিস্ময়কর আলোচনা এলে সেখানে থামতেন। উপদেশমূলক ও শাস্তির আয়াতে কাঁদতেন এবং সুসংবাদের আয়াত তিলাওয়াতকালে আনন্দিত হতেন। কুরআনের আদেশ-নিষেধ ও যাবতীয় বিধান-মাফিক নিজেদের জীবন গড়ে তুলতেন।

ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার নবীজি ﷺ তাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতে বললে তিনি 'সূরা নিসা'র প্রথমাংশ তিলাওয়াত করেন। যখন এই আয়াতে পৌঁছেন—

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৪৬৫৩; *সহীহ মুসলিম* : ৭৯৮

Contents
অতএব, কেমন হবে তখন, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে উপস্থিত করব তাদের ওপর সাক্ষীরূপে?[১]

তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ব্যস, যথেষ্ট।

ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এসময় আমি নবীজির দিকে তাকিয়ে দেখি, তার চক্ষুদ্বয় থেকে অনবরত অশ্রু ঝরছে! প্রিয়তমের বাণী শ্রবণে কান্না আটকে রাখা যে বড় দায়!

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে সাহাবীগণ একত্র হলে তিনি আবু মূসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে বলতেন, আমাদের রবের কথা স্মরণ করিয়ে দাও। আবু মূসা তখন তার সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত আরম্ভ করতেন, আর সাহাবীগণ সকলে অঝোরে কাঁদতে শুরু করতেন।

কিন্তু পরবর্তীজনেরা যখন তিলাওয়াত শ্রবণের মানসিকতা হারিয়ে ফেলে, তখনই তাদের নৈতিক অবক্ষয় শুরু হয়। চারিত্রিক অবনতি ঘটে এবং মেধা ও বোধশক্তি লোপ পায়।

কুরআনের স্থলে মানুষ অন্যকিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ার ফলে যাবতীয় ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হয়। নানা রকম বিপদাপদ ও বালা-মুসিবত দেখা দেয়। মানহাজগত বিচ্যুতি ঘটে; অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ও গোলযোগপূর্ণ হয়ে পড়ে। মুসলিমদের শক্তি-সাহস ও সংকল্প পর্যবসিত হয় হতাশা ও ব্যর্থতায়। অতএব, আমাদের কুরআনের কাছে ফিরতেই হবে। কুরআন পড়তেই হবে। কারণ—

- কুরআনের মিশন হচ্ছে মানুষকে হিদায়াত ও সিরাতুল মুসতাকীমের পথ প্রদর্শন করা।
- কুরআন হচ্ছে আলোকবর্তিকা। যাবতীয় রোগের শিফা[২]। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং শিক্ষা ও দর্শনের কেন্দ্রস্থল।
- কুরআন আমাদের প্রাণশক্তি। জীবনের অবলম্বন এবং সুখ ও সৌভাগ্যের সোপান।

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ৪১

[২] সুস্থতা লাভের উপাদান

■ কুরআন হচ্ছে ঐশীবাণী, স্রষ্টার সংবিধান এবং কুরআনই হচ্ছে শাশ্বত ও চিরন্তন বিজ্ঞান-দর্শন।

সুতরাং, আমরা কি কুরআন দিয়ে নিজেদের জীবন গড়তে পারি না? পারি না রামাদান ও বাকি এগারো মাস কুরআন নিয়ে কাটাতে? যদি পারি, তবে এই মহাগ্রন্থের বরকতে আমাদের জীবনযাত্রা আরও মসৃণ হবে। জীবনমান আরও উন্নত হবে। সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি হতাশার ঘোর কেটে নেমে আসবে শুভ্র প্রভাত। আমরা কি পারব এমনটা করতে?

যিকিরের গুঞ্জন

সিয়াম পালনকারীদের মুখে সর্বদা বিশেষ একটি সুর গুঞ্জরিত হতে থাকে। সব সময় যিকির, তাসবীহ, তাহলীল ও ইসতিগফার চলতে থাকে। রামাদানে যখন দিন অনেক বড় হয়, আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থাকার ফলে তখনো তাদের কাছে দিনগুলো নিতান্তই ছোট মনে হয়। যিকিরের আমেজে তাদের ক্ষুধা নিবারিত হয়। কারণ, যিকির তাদের ইহকালীন সফলতা ও পরকালীন সৌভাগ্যের প্রতীক। তারা আল্লাহকে স্মরণ করে, তাই আল্লাহও তাদের স্মরণ করেন। কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে—

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো।[১]

তারা আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, ফলে আল্লাহ তাদের নিয়ামত বাড়িয়ে দেন। কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে—

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫২

যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য নিয়ামত বৃদ্ধি করে দেবো।[১]

সত্যিকার সিয়াম পালনকারীগণ চলাফেরা, ওঠাবসা—সর্বাবস্থায়, সবখানে আল্লাহকে স্মরণ করেন। তাদের অবস্থার প্রশংসা বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন—

ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও যমীন সৃষ্টির বিষয়ে (তারা বলে) হে আমাদের রব, এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি। সকল পবিত্রতা তোমারই। সুতরাং, তুমি আমাদের আগুনের আযাব হতে রক্ষা করো।[২]

যারা সত্যিকার সিয়াম পালনকারী, আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্ত হয়। রবের ভালোবাসায় তাদের হৃদয় সিক্ত হয়। মহান আল্লাহ বলেন—

الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে; জেনে রাখো, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।[৩]

আবু মুসা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন—

“

مَثَلُ الَّذِى يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِى لا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ

[১] সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ০৭

[২] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯১

[৩] সূরা রা'দ, আয়াত : ২৮

যে তার প্রতিপালককে স্মরণ করে আর যে করে না তাদের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতের মতো। (অর্থাৎ, যে আল্লাহকে স্মরণ করে সে জীবিত। আর যে স্মরণ করে না সে মৃত।)[১]

আফসোস! আমাদের চারপাশে কত জীবন্মৃত মানুষ বিচরণ করে; খায়-দায়-ফূর্তি করে! কিন্তু আল্লাহর যিকিরের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে না। ফলে তারা জীবন্মৃত থেকেই মৃত্যুবরণ করে।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

"

سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ، قَالُوا : وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ

মুফাররিদরা অগ্রগামী হয়েছে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, মুফাররিদ কারা? তিনি বললেন, ওই সকল নারী-পুরুষ, যারা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।[২]

সিয়াম অবস্থায় যিকিরকারী ব্যক্তি সৎকাজে অগ্রগামী হবে। দ্রুত জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে থাকবে। তার আমলনামা হবে নেক আমল ও সৎকর্মে পরিপূর্ণ। অতএব, উপর্যুক্ত সুসংবাদ কেবল তারই জন্য।

মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর নবী ﷺ বলেন—

"

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، قَالَ: لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ

এক সাহাবী এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার কাছে ইসলামের বিধান অনেক বেশি মনে হয়। তাই আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন, যার ওপর আমি সর্বদা আমল করতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমার জিহ্বাকে সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সতেজ রাখবে।'[৩]

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৬৪০৭; *সহীহ মুসলিম* : ৭৭৯

[২] *সহীহ মুসলিম* : ২৬৭৬

[৩] *জামি তিরমিযী* : ৩৩৭৫; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৭৯৩

রাসূলের বাচনভঙ্গি কত চমৎকার! তিনি বললেন, 'তোমার জিহ্বাকে আল্লাহর যিকিরে সতেজ রাখবে'। এই সামান্য একটি কথায় কত কিছু চলে এসেছে!

সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির ক্ষুধা বা পিপাসা অনুভব হবে কী করে? সে তো সারা দিন মহামহিম আল্লাহর যিকিরে নিজেকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে। যিকিরের স্বাদ তাকে সব কিছু থেকে গাফেল করে দিয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আল্লাহর স্মরণে জিহ্বা সিক্ত রাখার অর্থ কী? এর অর্থ হচ্ছে প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে ও হৃদয়ের স্পন্দনে দু-ঠোঁটের মাঝখান থেকে রবের নাম উচ্চারিত হওয়া। যারা এই মানে ও পরিমাণে যিকির করে তারা আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয়ভাজন। তারা আল্লাহর প্রতিদানের সর্বাধিক হকদার। মহান আল্লাহ তাদের এই হক যথাযথভাবে আদায় করবেন এবং তাদের সর্বাধিক পুরস্কারে ভূষিত করবেন।

মানুষ যখন মহান প্রতিপালকের এই কল্যাণময় স্মরণ হতে বিমুখ হয় তখন তাদের ওপর রাজ্যের হতাশা নেমে আসে। বিষণ্ণতা তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। একেরপর এক দুশ্চিন্তা এসে তাদের সমস্ত সুখ কেড়ে নেয়। অথচ এসব দুঃশ্চিন্তা, হতাশা ও নিরাশার কার্যকরী প্রতিষেধক তাদের নাগালেই আছে; তবে তারা সেটা হয় বুঝতে পারছে না। কিংবা বুঝলেও প্রবৃত্তির তাড়নায় গ্রহণ করছে না। কী সেই প্রতিষেধক? দেখুন, কুরআনের ভাষায়—

أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

একমাত্র আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।[১]

অতএব, যিকিরই হচ্ছে সমস্ত অশান্তি ও মানসিক ব্যাধির মহৌষধ।

জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে নবীজি ﷺ বলেন—

“

مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ

[১] সূরা রা'দ, আয়াত : ২৮

যে-ব্যক্তি 'সুবাহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি' পাঠ করবে, প্রতিবারে তার জন্য জান্নাতে একটি করে খেজুরবৃক্ষ রোপণ করা হবে।[১]

এবার চিন্তা করুন তো, যিকির থেকে গাফেল ও গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তি কতগুলো মূল্যবান বৃক্ষ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে!

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন—

❝

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

এই কালিমাটি একবার পড়া আমার নিকট পৃথিবীর সমস্ত কিছুর চাইতেও অধিক প্রিয়।[২]

কীসের পৃথিবী? কীসের স্বর্ণালংকার, আর কীসের বড় বড় আট্টালিকা? এই সমস্ত কিছু এক পাল্লায় রাখলেও প্রিয়নবী ﷺ-এর মতে মাত্র একবার— سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ—পড়ার প্রতিদানের সমতুল্যও হবে না!

সুতরাং, এমন কেউ কি আছে, যে সর্বক্ষণ এই শব্দগুলো জপতে থাকবে এবং হাশরের ময়দানে শান্তি, নিরাপত্তা ও মহাপুরস্কার-লাভে ধন্য হবে? আছে কি কেউ?...

আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন—

❝

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى

---

[১] *জামি তিরমিযী* : ৫/৫১১

[২] *সহীহ মুসলিম* : ২৬৯৫

Contents

আমি কি তোমাদের সর্বোত্তম আমল সম্বন্ধে জানাব না—যা তোমাদের রবের নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের সম্মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্বর্ণ-রৌপ্য দান করার চেয়েও মহোত্তম; এমনকি শত্রুদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদের সংহার করা কিংবা তারা তোমাদের শহীদ করা অপেক্ষাও অধিকতর উত্তম? তারা বললেন, জি, অবশ্যই। তিনি বললেন, সেই মহোত্তম কাজটি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার যিকির।[১]

পুণ্যবান ব্যক্তিগণ ফজরের সালাত আদায়ের পর আপন স্থানে বসে যিকিরে মগ্ন হতেন। সূর্য ওপরে ওঠা পর্যন্ত যিকিরে মগ্ন থাকতেন। অনেকে পবিত্র কুরআন খুলে বসতেন। গভীর দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট ও আলঙ্কারিক আয়াত ও তার তাৎপর্য প্রত্যক্ষ করতেন। এতে তাদের অন্তর হতো কুরআনের আলোয় আলোকিত, আর আমলনামা হতো নেক আমল ও সৎকর্মে পরিপূর্ণ।

ব্যর্থ তো তারা, যারা রামাদান মাস পেয়েও তাকে যথাযথ কাজে লাগাতে পারে না। যিকির ও রবের তাসবীহ আদায়ের মধ্য দিয়ে সময়গুলো ব্যয় করতে পারে না।

এমন অটল অবিচল কেউ কি আছে, যে-জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো কাজে লাগাতে পারে?

---

[১] *জামি তিরমিযী* : ৩৩৭৭

রামাদান : বদান্যতার উর্বর ক্ষেত্র

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ

তোমরা নিজেদের জন্য যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহর নিকট পাবে।[১]

তিনি আরও বলেন—

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা এমন একটি শস্য-দানার মতো, যা উৎপন্ন করেছে সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তাকে আরও বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।[২]

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ১১০

[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৬১

Contents

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

“

নবীজি ﷺ ছিলেন সর্বাপেক্ষা দানশীল। আর রামাদানে যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি আরও বেশি দানশীল হতেন। এক কথায়, তিনি ছিলেন রহমতের বায়ু অপেক্ষাও অধিক দানশীল।[১]

সিয়াম মানুষকে ইয়াতীম-অসহায়, নিঃস্ব-হতদরিদ্র ও অন্নহীনদের অন্ন-বস্ত্রসহ সার্বিক সহায়তা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করে। কাজেই রামাদান হচ্ছে দাতা, সচ্ছল ও ধনিক-শ্রেণির দান-সাদাকা করার মৌসুম। দানের মাধ্যমে নেকীর পাহাড় গড়ার মহা সুযোগ। দানের প্রভূত কল্যাণ ও নেকীর কথা বর্ণনা করে আল্লাহর নবী ﷺ আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহুর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসে বলেন—

“

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصبِحُ العِبادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

প্রতিদিন সকাল বেলা দুজন ফেরেশতা অবতরণ করেন। অতঃপর তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ, আপনি দানকারীকে অনুরূপ প্রতিদান দিন। অপরজন বলেন, হে আল্লাহ, আপনি কৃপণের মাল ধ্বংস করুন।[২]

বান্দা যখনই দান করে, আল্লাহ তাকে শারীরিক উন্নতি ও মানসিক তৃপ্তি দান করেন। তার রিযিকে বরকত দেন। মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন—

“

الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

সাদাকা যাবতীয় গুনাহ মিটিয়ে দেয়, ঠিক যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।[৩]

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৬

[২] *সহীহ বুখারি* : ১৪৪২

[৩] *জামি তিরমিযী* : ২৬১৬

Contents

বস্তুত গুনাহের এক প্রকার উত্তাপ রয়েছে, যা অন্তরে উন্নতা সৃষ্টি করে। জীবনকে বিষিয়ে তোলে। আর এই বিষবাষ্প দূর করে একমাত্র সাদাকা।

সাদাকা হলো শীতল হাওয়া—যা মানুষের প্রাণ জুড়ায়। অন্তর থেকে মুছে ফেলে গুনাহের সকল কালিমা। উকবা ইবনু আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন—

❝

كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ

কিয়ামতের ময়দানে মানুষের হিসেব-নিকেশ শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকে তার সাদাকার ছায়ায় অবস্থান করবে।[১]

কত বিরাট ব্যাপার! সাদাকা কিয়ামতের সেই কঠিন মুহূর্তে মানুষের জন্য ছায়া হবে। সেদিন প্রত্যেকে তার নির্ধারিত সাদাকা পরিমাণ ছায়া লাভ করবে।

সাহাবীদের মধ্যে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অত্যন্ত ধনী। তিনি তার সমস্ত সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন। তাবুকের যুদ্ধে যাবতীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করেছেন। মুসলিমদের জন্য 'রূমা' নামক কূপ ক্রয় করেছেন এবং ব্যক্তিগত সমস্ত সহায়-সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের ভাষ্যমতে 'তিনি সত্বরই সন্তুষ্টি লাভ করবেন'।

আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন প্রচুর সম্পত্তির মালিক। একবার তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের আশায় সাতশো উট বোঝাই করা মাল মদীনাবাসীর মাঝে বিলিয়ে দেন; কিন্তু তারা কেন এভাবে দান করেছেন? কিংবা আমরাই বা কেন দান করবো? কারণ—

- এমন অনেক সিয়াম পালনকারী আছেন—যাদের কাছে ইফতারের জন্য এক টুকরো রুটি, এক ঢোক পানি কিংবা একমুঠো খেজুরও নেই!
- এমন অনেক সিয়াম পালনকারী আছেন—যাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, যাতায়াতের ভাড়া নেই; এমনকি বিপদের সময় পাশে দাঁড়ানোর অথবা সান্ত্বনা দেওয়ারও কেউ নেই।

---

[১] *মুসনাদে আহমাদ* : ১৭৩৩৩

Contents

- এমনও অনেক সিয়াম পালনকারী আছেন—যাদের কাছে সাহরী করার মতো ন্যূনতম খাবার নেই। এমনকি স্বল্প আয়ের সংসারে ক্ষুধার্ত সন্তানের মুখের দিকে তাকালে ইফতারেরও কোনো উপায় নেই!

এসব কারণেই নবী ﷺ রামাদানে দানের ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। বর্ণিত হয়েছে—

❝

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

যে ব্যক্তি কোনো সিয়াম পালনকারীকে ইফতার করাবে, সে তার অনুরূপ সাওয়াব লাভ করবে; কিন্তু এতে সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির সাওয়াব বিন্দুমাত্র হ্রাস পাবে না।[১]

সমাজের সৎ ও মহান ব্যক্তিবর্গ রামাদান মাসে অত্যন্ত উদারমনা হন। গরীব-দুঃখীদের অকাতরে দান করেন। অনেক দ্বীনদার ভাই সাওয়াবের আশায় সমাজের দরিদ্রশ্রেণির লোকদের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইফতারের আয়োজন করেন। এটা অনেক ভালো গুণ। বিরাট সাওয়াবের কাজ। সালাফগণও এমন করতেন। তারা রামাদানে প্রতিটি মসজিদে গরীব ও মুসাফিরদের জন্য ইফতার ও খাবারের ব্যবস্থা করতেন। ফলে কোনো এলাকায় ক্ষুধার্ত ও খাবারবঞ্চিত কাউকে খুঁজে পাওয়া যেত না।

দেখুন, খাবার-দাবার এবং পোশাক-আশাকের পেছনে যে-অর্থ ব্যয় করা হয়, তা কখনো ফিরে আসে না; বরং এতে সম্পদ ক্রমশ হ্রাস পায়; তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে-সম্পদ খরচ করা হয়, তার সবটুকু রয়ে যায়; বরং বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহর ঘোষণা—

إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করো তবে তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বিগুণ করে দেবেন। উপরন্তু তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, সহনশীল।[২]

---

[১] *জামি তিরমিযী* : ৮০৭

[২] সূরা তাগাবুন, আয়াত : ১৭

Contents

হে সিয়াম পালনকারী ভাই, আপনার দান-সাদাকা-ই আপনার একমাত্র সঞ্চয়। কিয়ামতের দিন যখন চরম সংকট ও দুঃসময়ে নিপতিত হবেন তখন সাদাকা-ই আপনার পাশে এসে দাঁড়াবে। সূর্য যখন খুব নিচে এসে আপনাকে দগ্ধ করবে তখন এই সাদাকা-ই সুশীতল ছায়া হয়ে আপনাকে সঙ্গ দেবে।

সুতরাং ভাই আমার, একটু ভেবে দেখুন, গরীবকে দেওয়া আপনার একঢোক পানি, একটুখানি দুধ, একমুঠো খেজুর, সামান্য অর্থ, খাবার কিংবা সাধারণ একটি বস্ত্র হতে পারে আপনার জান্নাতের ওসিলা। সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখুন, সাদাকা সম্পদ হ্রাস করে না; বরং সংরক্ষণ করে। যাকাত সম্পদ নিঃশেষ করে না; বরং পরিশুদ্ধ করে। এতএব, যাকাত এবং সাদাকা ব্যতীত আপনি কিছুতেই সম্পদ সংরক্ষণ অথবা পরিশুদ্ধ করতে পারবেন না। কত কত সম্পদশালী এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে—যাদের অর্থবিত্ত, ধন-সম্পদ ও বিশাল বিশাল অট্টালিকা আজ নিস্তব্ধ পড়ে আছে। পার্থিবজীবনে এগুলো তাদের দুশ্চিন্তা ও বিড়ম্বনার কারণ হয়েছে। উপযুক্ত স্থানে ব্যয় না করার কারণে হাশরের দিনও এগুলো তাদের লজ্জা ও অনুতাপের কারণ হবে!

কাল বিচারদিবসে আপনার সামনে সব লাভ-লোকসান স্পষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং প্রস্তুত হোন! একমাত্র আল্লাহ-ই হবেন আপনার আশ্রয়স্থল!
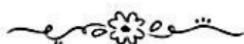
রামাদান : রাত্রি-জাগরণের স্বর্ণালি মুহূর্ত

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝

হে বস্ত্রাবৃত, রাতের কিছু অংশ ব্যতীত রাতজেগে সালাত পড়ুন; অর্ধরাত কিংবা তদপেক্ষা কিছু কম। অথবা তদপেক্ষা বেশি। আর কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরে ধীরে—সুস্পষ্টভাবে।[১]

এভাবেই আল্লাহ তার প্রিয় রাসূলকে নির্দেশ করেছেন। রাসূল ﷺ-ও এই নির্দেশ পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করেছেন। রাতে দীর্ঘ সময় ধরে ইবাদাত করেছেন। রবের দরবারে অশ্রু নিবেদন করেছেন এবং খুশূ-খুযূর সাথে সালাত আদায়ে নিমগ্ন থেকেছেন।

মহান আল্লাহ অন্যত্র তার নবীকে রাত্রি-জাগরণের নির্দেশ দিয়ে ও তার প্রতিদান ঘোষণা করে বলেন—

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

[১] সূরা মুযযাম্মিল, আয়াত : ১–৪

আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করুন। এটা আপনার অতিরিক্ত দায়িত্ব। শীঘ্রই আপনার পালনকর্তা আপনাকে উন্নীত করবেন প্রশংসিত স্থানে।[১][২]

দিনে সিয়াম পালন ও রাতে সালাত আদায়ের মাস এই রামাদান। দিনভর সিয়াম পালন শেষে আঁধার রাতে নির্জনে সালাত আদায়ে যে-মধুর আত্মতৃপ্তি, তা একমাত্র সিয়াম পালনকারী ব্যতীত অন্যকেউ অনুভব করতে পারে না।

যারা প্রকৃত অর্থেই সিয়াম পালন করে, রামাদানের রাতগুলো তাদের কাছে খুব বেশি সংক্ষিপ্ত মনে হয়। কারণ, আনন্দমুখর সময়গুলো কীভাবে যেন ফুরিয়ে যায়। আর নিরানন্দ অবসরের সময় যেন শেষই হতে চায় না। সৎকর্মশীলদের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন—

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

তারা রাতের সামান্য অংশেই নিদ্রা যায়।[৩]

ফলে তাদের রাত হতো সুখময়।

রাতের শেষ প্রহরে তাদের অবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন—

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে।[৪]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে—

---

[১] অর্থাৎ, এই রাত্রি-জাগরণ হবে কিয়ামত দিবসে আপনার প্রশংসার উচ্চ শিখরে পৌঁছার অন্যতম প্রধান সিঁড়ি।

[২] সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত : ৭৯

[৩] সূরা যারিয়াত, আয়াত : ১৭

[৪] সূরা যারিয়াত, আয়াত : ১৮

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

এবং তারা শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনা করে।[১]

এভাবে তাদের শেষরাতগুলো হতো ছবির মতো সুন্দর।

মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ রাতের আঁধারে অঝোরে কাঁদতেন। রবের দরবারে ফরিয়াদ করতেন। হৃদয়ের সবটুকু বিনয় ও কোমলতা ঢেলে দিয়ে মিনতি জানাতেন; কিন্তু দিন হলেই জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। বিজয় অথবা শাহাদাত অবধি যুদ্ধ করে যেতেন। হৃদয়ের কঠোরতা ও নির্মমতায় কাফিরদের ভস্ম করতেন।

অপরদিকে রাতের প্রথমভাগে তাদের ঘর হয়ে উঠত তিলাওয়াত, যিকির, ঈমান, ইসলাম ও ইসলামী শিষ্টাচার শিক্ষার অনন্য পাঠশালা; কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমানে আমাদের ঘরগুলো হচ্ছে গান-বাদ্য, নাটক-সিনেমা এবং অনর্থক ও অশ্লীল কর্মকাণ্ডের আখড়া। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন।

বস্তুত, যখন থেকে আমরা রাত্রি-জাগরণ ও রবের স্মরণে অশ্রুপাত ছেড়ে দিয়েছি, তখন থেকে ধীরে ধীরে আমাদের অন্তরগুলো শক্ত হতে শুরু করেছে। ঈমান দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই শত চেষ্টা সত্ত্বেও এখন আর আমাদের চোখে পানি আসে না!

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে নবীজি ﷺ আমাদের রামাদানে রাত্রি-জাগরণের ব্যাপারে উৎসাহিত করে বলেন—

"

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যে-ব্যক্তি রামাদানে ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় রাত জাগবে এবং সালাত আদায় করবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে।[২]

---

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৭

[২] *সহীহ বুখারী* : ২০০৮; *সহীহ মুসলিম* : ১৭৪

রাত্রি-জাগরণ ও সালাত আদায়ে উৎসাহ পেতে এই আয়াতগুলোও স্মরণ করা যেতে পারে—

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

যে-দিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে।[১]

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ

তবে কি সে জানে না, যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে?[২]

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ

এবং অন্তরে যা আছে, তা প্রকাশ করা হবে?[৩]

পাশাপাশি কবরের অন্ধকার, সংকীর্ণতা ও ভীতিকর দৃশ্যও কল্পনা করা যেতে পারে; বরং কল্পনা করাও উচিত; কারণ, রাত জেগে সালাত আদায় করলে অন্ধকার কবরে তা আলোর প্রদীপ হয়ে জ্বলতে থাকবে। এছাড়াও রাতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব, ফযীলত এবং গুনাহ মাফের কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

রাতে ইবাদাতের ক্ষেত্রে সালাফগণের পদ্ধতি ছিল বিভিন্ন রকম। কেউ রুকু অবস্থায় দীর্ঘ সময় কাটাতেন। কেউ সিজদায় পড়ে থাকতেন। কেউ দাঁড়ানো অবস্থায় তিলাওয়াত করতে থাকতেন। কেউ কান্নারত অবস্থায় তিলাওয়াত করতেন। আর কেউ একমনে যিকির ও আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ে নিমগ্ন থাকতেন। এভাবেই তারা সারা রাত কাটিয়ে দিতেন।

---

[১] সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত : ৬

[২] সূরা আদিয়াত, আয়াত : ৯

[৩] সূরা আদিয়াত, আয়াত : ১০

এই যদি হয় আমাদের পূর্বসূরীদের অবস্থা, তবে আজ আমাদের ঘর কেন ইবাদাতশূন্য? আমাদের ঘর থেকে কেন আজ তিলাওয়াতের আওয়াজ আসে না? কেন আজ ঘরে তাহাজ্জুদ পড়ার মতো কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না? আফসোস!

রাত যখন গভীর হয় তখন অলস ও গাফেলরা ঘুমিয়ে পড়ে। ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত লোকদের অন্তরগুলো গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। অপরদিকে আল্লাহর মুমিন বান্দা-বান্দীদের অন্তরগুলো তখনো জেগে থাকে। তারা কিছুতেই ঘুমোতে পারেন না। কবরের আযাব ও আল্লাহর শাস্তির ভয়ে তাদের দু-চোখ বেয়ে টপটপ করে অশ্রু ঝরে পড়ে। কবর, হাশর-নাশর ও কঠিন শাস্তির কথা যার স্মরণে থাকে, সে কী করে ঘুমোতে পারে?

আজকের মুসলিমপ্রজন্ম ইবাদাত তো দূরে থাক, রাতভর দাবা, জুয়া আর গান-বাদ্যে মজে থাকে! আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ তাকে বলেন—

“

يَا عَبْدَ اللَّهِ ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

হে আব্দুল্লাহ, তুমি অমুকের মতো হয়ো না, যে একসময় রাতজেগে করে সালাত আদায় করত; কিন্তু এখন তা ছেড়ে দিয়েছে।[১]

[১] *সহীহ বুখারী* : ১১১৪

রামাদান : ইসলামী পরিবার গঠনের অনিঃশেষ চেতনা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

যে-ব্যক্তি তার গৃহের ভিত্তি আল্লাহর তাকওয়া ও সন্তুষ্টির ওপর স্থাপন করে, সে উত্তম? নাকি যে তার গৃহের ভিত্তিস্থাপন করে কোনো গর্তের পতনোন্মুখ কিনারায়? অতঃপর তাকে নিয়ে তা ধ্বসে পড়ে জাহান্নামের আগুনে। আর আল্লাহ যালিমদের হিদায়াত দেন না।[১]

'ইসলামী পরিবার' বলতে এমন পরিবারকে বোঝায়, যার মূল অবকাঠামো তাকওয়া, খোদাভীতি, সততা, ধার্মিকতা এবং পরিপূর্ণ ইসলামী চিন্তাধারার আলোকে গড়া।

মহান আল্লাহ আরও বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

[১] সূরা তাওবা, আয়াত : ১০৯

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে নিয়োজিত রয়েছে নির্মম প্রকৃতি ও কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ, আল্লাহ তাদের যে-নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে-ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না এবং তারা তা-ই করে যা তাদের আদেশ করা হয়।[১]

প্রতিটি পরিবার তার অভিভাবকদের কাছে আমানত। পরিবার সম্পর্কে তাদের একদিন জিজ্ঞাসিত হতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—

“

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُول عَنْ رَعِيَّتِهِ

জেনে রেখো, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল; প্রত্যেককেই তার অধীনদের কার্যাবলির জন্যে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।[২]

রামাদান ও অন্যান্য মাসে ঘরের সদস্যদের সালাত আদায়ের আদেশ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন—

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

তিনি তার পরিবারবর্গকে সালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি ছিলেন তার পালনকর্তার নিকট পছন্দনীয়।[৩]

একটি সভ্য-সুন্দর মুসলিম পরিবার গঠনে একজন দায়িত্ববান পিতা ও বুদ্ধিমতী মায়ের বিকল্প নেই। পবিত্র কুরআন বলছে—

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

---

[১] সূরা তাহরীম, আয়াত : ০৬

[২] *সহীহ বুখারী* : ৭১৩৮; *সহীহ মুসলিম* : ৪৬১৮

[৩] সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৫৫

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও।[১]

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় আমানত হচ্ছে, তার পরিবার ও সন্তান-সন্ততি। সুতরাং, এই আমানত যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা এবং নিরাপদ অবস্থায় মহান আল্লাহর হাতে অর্পণ করা প্রত্যেক মা-বাবার অবশ্য কর্তব্য। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই আমানত রক্ষা করতে হলে এবং এই দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতে হলে রামাদানে প্রতিটি মুসলিমঘরে আল্লাহর ভয়, যিকির এবং সিয়াম ও সালাত নিশ্চিত করতে হবে। সেই সঙ্গে আহার-নিদ্রাসহ ব্যবহারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুন্নাতে নববীর পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। বিশেষত মেয়েদের শরয়ী পর্দা ও হিজাব-নিকাব নিশ্চিত করতে হবে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে অনেক মুসলিম পরিবার সারা দিন নাচ-গানে মত্ত থাকে। সালাত-সিয়াম, হিজাব-নিকাব—কোনো কিছুর ধার ধারে না। নিঃসন্দেহে তারা বিকারগ্রস্ত। তাদের আত্মা ব্যাধিগ্রস্ত। তাদের ভবিষ্যৎ অনিরাপদ এবং তাদের পারিবারিক অবকাঠামো ঝুঁকিপূর্ণ।

মুসলিম পরিবারে গান-বাদ্য ও অশ্লীলতা ঢুকে পড়ায় ঘর থেকে আজ যিকির ও রহমত-বরকত উঠে গেছে এবং এটাই হবার ছিল। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

একশ্রেণির লোক আছে, যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অন্ধভাবে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে এবং আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।[২]

আলিমদের মতে, উক্ত আয়াতে 'অবান্তর কথাবার্তা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গান-বাজনা। কারণ, এসব গান-বাজনাই মানুষকে অনর্থক ও অশ্লীল কর্মকাণ্ডে লিপ্ত করে।

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ৫৮

[২] সূরা লুকমান, আয়াত : ০৬

অপর দিকে পবিত্র কুরআনে মুমিনের সিফাত ও গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে—

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত।[১]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে নবীজি ﷺ বলেন—

"

اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنَّ الاسْتِحْيَاءَ مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ: أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْتَذْكُرْ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ

তোমরা আল্লাহকে লজ্জা করার মতো লজ্জা করো। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, 'আলহামদু লিল্লাহ, আমরা তো লজ্জা করি। তিনি বললেন, এ লজ্জা নয়, আল্লাহকে পরিপূর্ণ লজ্জা করার অর্থ—তুমি তোমার মস্তিষ্ক ও চিন্তা-চেতনার হিফাযত করবে। তুমি উদর ও খাবারের হিফাযত করবে এবং মৃত্যু ও মৃত্যু-পরবর্তী পরিণতিকে বেশি বেশি স্মরণ করবে। যে-ব্যক্তি আখিরাত কামনা করে, সে দুনিয়ার সৌন্দর্যকে ছেড়ে দেয়। অতএব, যে-ব্যক্তি এ কাজগুলো মেনে চলে, সে অবশ্যই আল্লাহকে লজ্জা করার মতো লজ্জা করে।[২]

আহ! যদি আজ প্রতিটি মুসলিম পরিবার পরিপূর্ণভাবে ইসলামকে গ্রহণ করত, তবে আমাদের ঘরগুলো ঈমান ও ইলমের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠত। খুশূ-খুযূর সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়, রাত-দিন কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর যিকির ও সর্বক্ষেত্রে সুন্নাহর বাস্তবায়নের পাশাপাশি যাবতীয় অনর্থক ও অশ্লীল কর্মকাণ্ড পরিত্যাগের মাধ্যমেই একটি নিখুঁত পরিবারব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। মহান আল্লাহ বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

---

[১] সূরা মুমিনুন, আয়াত : ০৩

[২] *জামি তিরমিযী : ২৪৫৮*

নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, (মৃত্যুর সময়) তাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় আর বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না; বরং জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো—যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছে।[১]

তিনি আরও বলেন—

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

আল্লাহ অবিচল রাখেন ঈমানদারদের সুদৃঢ় বাণী দ্বারা—পার্থিব জীবনে এবং পরকালে। আর আল্লাহ যালিমদের করেন পথভ্রষ্ট। আর আল্লাহ যা ইচ্ছা, তা করেন।[২]

নিশ্চয়ই রামাদান প্রতিটি মুসলিম পরিবারে অন্যরকম এক অনুভূতি ও প্রশান্তির আমেজ নিয়ে আসে। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে সিয়াম পালন ও আল্লাহর স্মরণের প্রতি উৎসাহিত করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾

নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে—তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে, যাতে কখনো লোকসান হবে না। এজন্য যে, আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের আরও বেশি দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।[৩]

[১] সূরা হা-মীম, আয়াত : ৩০

[২] সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ২৭

[৩] সূরা ফাতির, আয়াত : ২৯-৩০

মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের প্রতিটি ঘর ঈমান, হিকমাহ ও আপন রহমতের ছায়ায় ঢেকে দেন!

হৃদয়ের সিয়াম

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ

যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন।[১]

উল্লেখ্য যে, হৃদয়ের হিদায়াতই হচ্ছে সমস্ত হিদায়াতের মূল। সফল ও নিরাপদ জীবনের উৎস। সকল কাজের পাপ-পুণ্যের নিক্তি। সর্বোপরি সকল সৎকাজ ও নেক আমলের তাওফীক লাভের প্রধান কারণ। এ প্রসঙ্গে নবীজি ﷺ বলেন—

“

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

জেনে রাখো, মানবদেহে এমন একটি ‘মুদগা’ তথা মাংসপিণ্ড রয়েছে। এই পিণ্ডটি সুষ্ঠু হলে সমগ্র দেহ সুষ্ঠু হয়; আর তা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সমগ্র দেহই ক্ষতিগ্রস্ত হয়; জেনে রাখো, তা হলো ‘কলব’ তথা অন্তর।[২]

---

[১] সূরা তাগাবুন, আয়াত : ১১

[২] *সহীহ বুখারী* : ৫২

সুতরাং, অন্তরের পরিশুদ্ধি হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার চাবিকাঠি। আর কারও অন্তর অকেজো হয়ে গেলে তার ধ্বংস অনিবার্য! মহান আল্লাহ বলেন—

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার অনুধাবন করার মতো অন্তর রয়েছে অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে।[১]

প্রতিটি মাখলুকের অন্তর রয়েছে। তবে সব অন্তর এক নয়। কিছু অন্তর জীবিত; ঈমান, ইয়াকীন ও তাকওয়ায় পরিপূর্ণ। আর কিছু অন্তর মৃত, রুগ্ন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন! গুনাহগার ও আত্মার ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন—

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً

তাদের অন্তঃকরণ ব্যাধিগ্রস্ত, আর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন।[২]

তিনি আরও বলেন—

وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ

এবং তারা বলে, আমাদের হৃদয় আবৃত; বরং তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত করেছেন। ফলে তারা খুব কমই ঈমান আনে।[৩]

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআনের মর্ম-বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?[৪]

---

[১] সূরা কাফ, আয়াত : ৩৭

[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ১০

[৩] সূরা বাকারা, আয়াত : ৮৮

[৪] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ২৪

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ

তারা বলে, তুমি যে-বিষয়ের প্রতি আমাদের আহ্বান করছ, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত, আমাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে রয়েছে অন্তরাল। অতএব, তুমি তোমার কাজ করো এবং আমরা আমাদের কাজ করি।[১]

এসকল আয়াতে সুস্পষ্ট যে, মানুষের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত ও তালাবদ্ধ হয়। অতঃপর একপর্যায়ে তা মরে যায়।

আল্লাহর দুশমনদের দেহে অন্তর রয়েছে, কিন্তু সেই অন্তর মৃত। মহান আল্লাহ বলেন—

لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا

তাদের অন্তর রয়েছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না।[২]

এজন্যই নবীজি ﷺ এই দুআটি বেশি বেশি পড়তেন—

“

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

হে অন্তর পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের ওপর সুদৃঢ় রাখো।[৩]

মুমিনের অন্তর রামাদানে সিয়াম পালন করে। আর অন্তরের সিয়াম হচ্ছে, যাবতীয় শিরক ও ঈমান বিধ্বংসী কাজ থেকে তাওবা করে নিজেকে পবিত্র করা এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে নিজেকে রক্ষা করা।

---

[১] সূরা হা-মীম, আয়াত : ০৫

[২] সূরা আরাফ, আয়াত : ১৭৯

[৩] *জামি তিরমিযী* : ৩৫২২

এ মাসে আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসায় আবাদ হয় মুমিনের অন্তর। আল্লাহর পবিত্র নাম ও গুণাবলীর সাহায্যে তাঁর পরিচয় লাভ করে—যেভাবে তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন পবিত্র কুরআনে। অন্তরচক্ষু দিয়ে তাঁর নিখিল সৃষ্টি ও বস্তুজগৎ অবলোকন করে—যেভাবে অবলোকনের আদেশ করেছেন তাঁর কিতাবে।

প্রকৃত মুমিনের অন্তর হয় ঈমানের নূর ও রিসালাতের চিরন্তন আলোয় উদ্ভাসিত। ফলে ঐশী জ্ঞান ও আল্লাহপ্রদত্ত বিদ্যার পরশে সে হয়ে ওঠে একজন 'আলোকিত মানব'। আর এই আলোর সাথে তখন যুক্ত হয় অন্য একটি আলো—সৃষ্টি ও প্রকৃতিগত বিশ্বাসের আলো—যা জন্মগতভাবে প্রতিটি মানুষ লাভ করে থাকে।

তার মাঝে তখন উভয় আলোর চমৎকার সমন্বয় ঘটে। কুরআনের ভাষায়—

نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

জ্যোতির ওপর জ্যোতি! আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে; আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন এবং তিনি সব বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত।[১]

একজন মুমিন বান্দার অন্তর হচ্ছে প্রদীপ সদৃশ। কুরআন তিলাওয়াতের ফলে এই প্রদীপের আলো ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। আর কুরআনের অর্থ ও মর্ম উপলব্ধির কারণে তার ঈমান হয় আরও প্রবল; বিশ্বাস হয় আরও উন্নত।

সিয়াম মুমিনের অন্তরকে অহংকার মুক্ত রাখে। কারণ, অহংকার মানুষের অন্তর কলুষিত করে। অহংকারী ব্যক্তি নির্বোধ, উদ্ভ্রান্ত ও অতি আমুদে হয়। হাদীসে কুদসীতে এসেছে—

"

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي ، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا، قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অহংকার হচ্ছে আমার চাদর এবং বড়ত্ব হচ্ছে আমার পোশাক। সুতরাং, যে-ব্যক্তি এ দুয়ের কোনোটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানি করবে, তাকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।'[২]

---

[১] সূরা নূর, আয়াত : ৩৫

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪০৯০, ভিন্ন শব্দে *সহীহ মুসলিম* : ২৬২০

নবীজি ﷺ বলেন—

"

مَنْ تَوَاضَعَ للهِ دَرَجَةً رَفَعَهُ اللهُ دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّيْنَ، وَمَنْ تَكَبَّرَ عَلَى اللهِ دَرَجَةً وَضَعَهُ اللهُ دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَسْفَلِ السَّافِلِيْنَ

যে-ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হবে, আল্লাহ তার সম্মান বৃদ্ধি করতে করতে তাকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করবেন। আর যে-ব্যক্তি আল্লাহর ওপর অহংকার প্রদর্শন করবে, আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করবেন এবং একপর্যায়ে তাকে সবচেয়ে অপদস্থ করবেন।[১]

সিয়াম মানুষকে অহমিকা থেকে বিরত রাখে। অহমিকা মানে নিজেকে সবচেয়ে যোগ্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অন্যদের চেয়ে উত্তম মনে করা। রাসূল ﷺ বলেন—

"

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ فَشُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ

তিনটি জিনিস মানুষকে ধ্বংস করে। এক. কৃপণতা অবলম্বন। দুই. প্রবৃত্তির অনুসরণ। তিন. অহমিকা প্রদর্শন।[২]

অহমিকা হচ্ছে একটি রোগ। আর এই রোগের চিকিৎসা হলো, সর্বদা নিজের দোষ-ত্রুটি এবং ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় করা যাবতীয় গুনাহের কথা স্মরণ করা। কুরআনের এই আয়াতটি বারবার পড়া—

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى

মূসা বললেন, তাদের (সমস্ত কৃতকর্মের) খবর আমার পালনকর্তার নিকট লিখিত রয়েছে। আমার পালনকর্তা ভ্রান্ত হন না এবং বিস্মৃতও হন না।[৩]

[১] *মুসনাদে আহমাদ* : ১১৭২৪

[২] *মিশকাতুল মাসাবীহ* : ৫১২২

[৩] সূরা ত্বহা, আয়াত : ৫২

সিয়াম পালনকারী মুমিনের অন্তর সদা হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত থাকে। কেননা, হিংসা নেকী ধ্বংস করে। অন্তর তমসাচ্ছন্ন করে; অধিকন্তু এই হিংসাই স্রষ্টার নৈকট্যলাভের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। মহান আল্লাহ বলেন—

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

তাহলে কি তারা মানুষকে এই জন্য হিংসা করে যে, আল্লাহ তাদের স্বীয় অনুগ্রহে কিছু দান করেছেন?[১]

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন—

“

لا تَحَاسَدُوا، ولا تَنَاجَشُوا ولا تَبَاغَضُوا، ولا تَدَابَرُوا، ولا يَبِعْ بَعْضُكم على بَيْعِ بعضٍ

পরস্পর হিংসা কোরো না। বিদ্বেষ ছড়িয়ো না। শত্রুতা পোষণ কোরো না। একে অন্যের ছিদ্রান্বেষণ কোরো না এবং অপর ভাইয়ের দামের ওপর দাম বাড়িয়ে কোনো বস্তু ক্রয় কোরো না।[২]

রাসূল ﷺ একদা এক ব্যক্তি সম্পর্কে তিনবার বলেন যে, এই লোকটি জান্নাতী। অতঃপর যখন তার আমল সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হয় তখন সে বলে, প্রতি রাতে ঘুমানোর পূর্বে আমি সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ ও অপর মুসলিম ভাইয়ের প্রতি ঘৃণাবোধ অন্তর থেকে দূর করি। এরপর ঘুমাই।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং ঈমানের ওপর সদা অটল ও অবিচল রাখুন। আ-মীন।

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ৫৪

[২] *সহীহ মুসলিম* : ২৫৬৪

জিহ্বার সিয়াম

বস্তুত, মানুষের জিহ্বা ও মুখেরও একপ্রকার সিয়াম রয়েছে—যা কেবলমাত্র অনর্থক কথাবার্তায় নির্লিপ্ত ব্যক্তিরা বোঝে। এই সিয়াম যেমন রামাদানে পালন করতে হয়, তেমনই রামাদানের বাইরেও পালন করতে হয়। বিশিষ্ট সাহাবী মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবীজি ﷺ তার জিহ্বার দিকে ইশারা করে বলেন—

"

كُفَّ عَلَيكَ هذا. قُلت يَا نَبِيَّ الله وإنَّا لَمُؤاخَذون بما نَتكلَّم به قال: ثَكِلَتكَ أُمّكَ يَا مُعاذ وهل يَكُبُّ النَّاسَ على وُجوهِهم فِي النَّار إلَّا حَصائدُ أَلسِنَتِهم

'তুমি একে সংযত রাখো'। মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বলি, হে আল্লাহর নবী, আমরা যা-কিছু বলি সেজন্য কি পাকড়াও হবো? তিনি বলেন, মুআয, তোমার মা তোমার জন্য কাঁদুক। মানুষ তো তার অসংযত কথাবার্তার কারণেই অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।[১]

জিহ্বার আক্রমণ অতি ভয়াবহ। আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় জিহ্বা টেনে ধরে কাঁদতেন আর বলতেন, 'এই জিহ্বা-ই আমাকে সমস্ত বিপদাপদের সম্মুখীন করেছে!

মানুষের জিহ্বা হিংস্র জন্তুর চেয়েও ভয়ানক। আগুনের লেলিহান শিখার চেয়েও মারাত্মক। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের জিহ্বাকে লক্ষ্য করে বলতেন—

---

[১] *জামি তিরমিযী* : ২৬১৬

"

يَا لِسَانُ قُلْ خَيْرًا تَغْنَمْ أَوِ اسْكُتْ عَنْ شَرٍّ تَسْلَمْ قَبْلَ أَنْ تَنْدَمَ

হে জিহ্বা, বললে ভালো কথা বলো। এতে উপকৃত হবে। অন্যথায় খারাপ কথা বলা থেকে চুপ থাকো, এতে নাজাত পাবে; লজ্জিত হতে হবে না।[১]

যে-সকল মুসলিম নিজের জিহ্বাকে অন্যের সমালোচনা, গীবত ও অনর্থক কথাবার্তা থেকে হিফাযত করে, আল্লাহ তাদের প্রত্যেকের ওপর রহম করুন! এমনকি যারা সর্বদা বুঝে শুনে, মেপে ঝুপে কথা বলে এবং কথার আদব বজায় রাখে, আল্লাহ তাদের প্রতিও রহম করুন!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

মানুষ যে-কথাই উচ্চারণ করে, তা সংরক্ষণের জন্য তার নিকটে একজন সদা তৎপর প্রহরী রয়েছে।[২]

অতএব, এটা স্পষ্ট যে, মানুষের প্রতিটি শব্দ ও বাক্যের হিসেব গ্রহণ করা হবে। এই হিসেব গ্রহণ অযৌক্তি বা অন্যায় নয়। কারণ, মহান আল্লাহ বান্দার সঙ্গে অন্যায় আচরণ করতে পারেন না; অধিকন্তু তিনি বলেন—

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

আপনার পালনকর্তা তাঁর বান্দাদের প্রতি মোটেই যুলুম করেন না।[৩]

সাহ্ল ইবনু সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন—

---

[১] *শুআবুল ঈমান, সুনানু বায়হাকী* : ৪৫৭৮

[২] সূরা কাফ, আয়াত : ১৮

[৩] সূরা হা-মীম, আয়াত : ৪৬

“

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

যে-ব্যক্তি তার দু-চোয়ালের মাঝের বস্তু অর্থাৎ জিহ্বা এবং দু-রানের মাঝের বস্তু অর্থাৎ লজ্জাস্থান—এর ব্যাপারে আমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারবে, আমি তার জান্নাতের যিম্মাদার হয়ে যাবো।[১]

সালাফগণ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নিজেদের স্বরযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতেন। খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া তারা কথা বলতেন না। এজন্য তারা যখন কথা বলতেন তখন সেটা হতো যিকির, উপদেশ কিংবা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের মতো মহিমান্বিত ইবাদাত। আর যখন চুপ থাকতেন তখন তাদের নীরবতা হতো আখিরাতের চিন্তা ও আল্লাহর ধ্যান-জ্ঞান।

যখন একজন নেককার মানুষের মনে আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভীতি জাগে, তখন সে সর্বদা যিকির, ফিকির ও তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ে নিমগ্ন থাকে এবং যাবতীয় পাপাচার ও অনর্থক কথাবার্তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

“

وَاللهِ مَا فِي الأَرْضِ أَحَقُّ بِطُولِ سِجْنٍ مِنْ لِسَانٍ

আল্লাহর শপথ! পৃথিবীতে সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণযোগ্য হচ্ছে এই জিহ্বা![২]

সৎকর্মশীল ব্যক্তিরা যখন কথা বলতে উদ্যত হন, তখন প্রথমে তারা এর ফলাফল ও পরিণাম নিয়ে চিন্তা করেন। অতঃপর অনেক ক্ষেত্রে চুপ হয়ে যান এবং শ্রোতাদের শত আগ্রহ সত্ত্বেও কথা বলা থেকে নিবৃত থাকেন।

যে-ব্যক্তি সিয়াম অবস্থায়ও মিথ্যা বলে, মানুষকে ধোঁকা দেয়, অন্যের গীবত করে, গালিগালাজ ও অশোভনীয় আচরণ করে, তার কীসের সিয়াম?! মুসলিম ভাইকে কষ্ট দিলে সিয়াম পালন করে কি লাভ? এমন সিয়াম কী আদৌ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে?

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৬৪৭৪

[২] *তাবরানী* : ৪৭৪৬

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন—

"

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার হাত ও মুখ হতে অপর মুসলিম নিরাপদ।[১]

মহান আল্লাহ বলেন—

وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

আমার বান্দাদের বলে দিন, তারা যেন এমন কথাই বলে, যা অতি সুন্দর। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি করে; নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।[২]

উপর্যুক্ত আয়াতে 'উত্তম কথা' বলতে নম্র-ভদ্র ও শিষ্টাচারপূর্ণ এমন বাক্য বিনিময়ের কথা বলা হয়েছে, যা কারও মনে আঘাত করে না এবং যাতে মানুষের সম্মান ও মর্যাদাও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না।

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন—

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো এটাকে ঘৃণাই করে থাকো। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।[৩]

কত মানুষ জিহ্বা ও মুখের অপব্যবহার করে সারা দিনের কষ্টের সিয়াম অবশেষে বরবাদ করে দিচ্ছে! সিয়ামের উদ্দেশ্য ক্ষুধা বা পিপাসা নয়; বরং প্রতিটি মানুষকে ভদ্র, সভ্য ও শিষ্ট করে গড়ে তোলা-ই হচ্ছে এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ১০

[২] সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত : ৫৩

[৩] সূরা হুজুরাত, আয়াত : ১২

জিহ্বার দ্বারা সাধারণত দশটি গোনাহ সংঘটিত হয়ে থাকে। যথা—মিথ্যা, গীবত, পরনিন্দা, গালিগালাজ, অশ্লীলতা, কদর্যতা, প্রতারণা, অভিসম্পাত, যাদুটোনা এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ। রামাদান বা রামাদানের বাইরে এর সব কয়টি-ই গুরুতর অপরাধ বলে বিবেচিত হয়।

মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়া আপনার একটি কথা-ই হতে পারে আপনার জাহান্নামের কারণ! অতএব, সাবধান!

আল্লাহপ্রদত্ত এই বাকযন্ত্র যেমন সফলতার চাবিকাঠি, তেমনই ব্যর্থতারও প্রধান কারণ! অতএব, যে-ব্যক্তি তার জিহ্বাকে সর্বদা যিকির, ইসতিগফার, শোকর ও তাওবায় বিরত রাখবে, এই জিহ্বা তার জন্য সফলতা বয়ে আনবে। তার চক্ষু শীতল করবে। অপরদিকে যে এর অপব্যবহার করবে, মানুষকে খোঁচা মেরে কথা বলবে, নিরীহদের অন্তরে আঘাত করবে, এই জিহ্বাই একদিন তার ব্যর্থতার কারণ হবে। তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে!

প্রিয় সিয়াম পালনকারী ভাই, সর্বাবস্থায় যিকির ও তিলাওয়াতরত থাকুন। অন্তরকে পরিশুদ্ধ করুন এবং গুনাহমুক্ত জীবন গড়ুন।

আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আ-মীন।

চোখের সিয়াম

চোখের সিয়াম হচ্ছে কু-দৃষ্টি ও যত্রতত্র দৃষ্টিপাত থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।[১]

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

আর মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে।[২]

আয়াতদ্বয় থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, চক্ষু মানুষের অন্তর পরিচালনা করে এবং এই চক্ষু-ই হচ্ছে আত্মার প্রবেশদ্বার।

---

[১] সূরা নূর, আয়াত : ৩০

[২] সূরা নূর, আয়াত : ৩১

একবার নবীজি ﷺ আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে বলেন—

“

يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ

হে আলী, কোনো নারীকে একবার দেখার পর দ্বিতীয়বার দেখবে না। কেননা, প্রথমবার অনিচ্ছায় দৃষ্টি পড়ে গেছে বিধায় সমস্যা নেই; কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখা জায়িয হবে না।[১]

দৃষ্টির হিফাযত না করার দশটি ক্ষতি রয়েছে—

এক. কোনো কাজে মন বসে না। সব সময় একপ্রকার অস্বস্তি অনুভব হয়। অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোকও স্থিরতা ও কাজের মনোবল হারায়।

দুই. কাউকে দেখার পর তাকে না পাওয়ার বেদনা হৃদয়কে অনবরত দংশন করতে থাকে। এই হতাশা ও অতৃপ্তি তখন দু-চোখের ঘুম কেড়ে নেয়।

তিন. সালাত, সিয়াম কিংবা কুরআন তিলাওয়াত—কোনো কিছুতেই আত্মতৃপ্তি আসে না। যিকিরে আত্মপ্রশান্তি অনুভব হয় না। এক কথায়, ইবাদাতের মাঝে যে ঈমানী স্বাদ, তা সম্পূর্ণ মাটি হয়ে যায়।

চার. এর দ্বারা বড় বড় গুনাহের সূত্রপাত হয়। অশ্লীলতা ও ব্যভিচারসহ অন্যান্য সামাজিক অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিও নেশা ও মাদকের অন্ধকার জগতে হারিয়ে যায়। ধর্ষণ, হত্যা ও আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

সালাফদের কেউ একজন বলেন, আমি পবিত্র কুরআনের হাফিয ছিলাম। একবার কোনো এক নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করি। ফলে চল্লিশ বৎসরে উপনীত হওয়ার পর আমি কুরআন ভুলে যাই। (আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুন)

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করার প্রাথমিক উপকারিতা হচ্ছে, অন্তরে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ অনুভূত হতে থাকে।

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ২১৪৯

সালাফগণ বলেন, দৃষ্টি হচ্ছে একজন কমান্ডারের মতো; যখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, মুহূর্তে শিকার করে আনবে; কিন্তু যখন তাকে আটকে রাখা হবে, সে আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হবে। দৃষ্টিকে উন্মুক্তভাবে ছেড়ে দিলে অন্তরের দূষণ অনিবার্য।

সালাফগণ আরও বলেন, যদি তুমি দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করো, তবে সে তোমাকে লাঞ্ছিত করবে। যখনই তাকে বন্ধনমুক্ত করবে, সে তোমাকে ভোগান্তিতে ফেলবে—ইহকালে কিংবা পরকালে।

শাহ কিরমানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে-ব্যক্তি চক্ষুকে অবনত রাখবে, অন্তরকে তাকওয়ায় সুসজ্জিত করবে, চাল-চলন ও বেশভূষায় সুন্নাহর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করবে—সে অবশ্যই আল্লাহপ্রদত্ত 'অন্তর্দৃষ্টি'লাভে ধন্য হবে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন—

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ

নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীলদের জন্য রয়েছে নিদর্শনাবলী।[১]

দৃষ্টির হিফাযত করার পাঁচটি সুফল রয়েছে—

এক. মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর আনুগত্যের গুণ অর্জিত হয়। আর এটাই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার একমাত্র পুঁজি।

দুই. অন্তর গুনাহমুক্ত থাকে, চিত্ত প্রফুল্ল থাকে এবং সর্বক্ষণ অন্তরে একপ্রকার তৃপ্তি ও আত্মপ্রশান্তি বিরাজ করে।

তিন. যাবতীয় ফিতনা ও জটিলতা থেকে মুক্ত থাকা যায়।

চার. আল্লাহর পক্ষ হতে ইলম, মারিফাত ও তাকওয়া লাভের পাশাপাশি সৎকাজের তাওফীক নসীব হয়।

পাঁচ. সত্যবাদী ও সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য ও অনুগ্রহলাভের উপায় এটি। এর মাধ্যমে তাদের অন্তরজগত আরও আলোকিত হয়।

---

[১] সূরা হিজর, আয়াত : ৭৫

যখন রামাদান মাস আমাদের দুআরে কড়া নাড়ে তখন আমাদের উচিত আপন আপন চক্ষুর হিফাযত করা। তাকে গুনাহমুক্ত রাখা। আর এটিই হচ্ছে 'চোখের সিয়াম'। সিয়াম পালনার্থে ক্ষুধার্ত থাকার ফলে চোখের অনেক উপকার হয়। যেমন—এক. চোখের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। **দুই.** অসৎ মনোবাসনা ও অপাত্রে দৃষ্টির কু-চাহিদা লোপ পায়।

নির্বোধ লোকেরা রাস্তায় চলার সময় এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করে। ফলে তারা শয়তানের খেলার বস্তু ও ক্রীড়নকে পরিণত হয়। শয়তান তাদের নানান গুনাহ ও অপরাধকর্মে লিপ্ত করে।

অনেকেই আছে যারা বাহ্যিকভাবে সিয়াম পালন করে, কিন্তু চক্ষু নিয়ন্ত্রণ না করার ফলে তাদের কল্প-জগতে হরদম অপকর্মের চিত্র ভাসতে থাকে।

প্রিয় ভাইয়েরা, আসুন আমরা সিয়াম পালনের পাশাপাশি নিজের আত্মা ও চক্ষুকেও গুনাহমুক্ত রাখি।

মহান আল্লাহ বলেন—

وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۝

এবং তাদের সবরের প্রতিদানে তাদের দেবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক। তারা সেখানে সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। তারা সেখানে রৌদ্র ও শৈত্য অনুভব করবে না।[১]

শান্তি বর্ষিত হোক তার প্রতি—যে সিয়াম অবস্থায় একমাত্র রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজের দৃষ্টির হিফাযত করে।

[১] সূরা দাহর, আয়াত : ১২-১৩

কানের সিয়াম

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

নিশ্চয়ই কান, চোখ এবং অন্তর, এ সব কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।[১]

সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে, কান যা কিছু শ্রবণ করে সে-সম্পর্কে আল্লাহর সামনে জিজ্ঞাসিত হবে। সৎলোক তারাই, যারা ভালো কথা শ্রবণ করে এবং সর্বোত্তম ও সবচেয়ে উপযোগী কথাটির অনুসরণ করে চলে। আর আফসোস তার জন্য, যে তার কানকে হেদায়াতের বাণী শ্রবণ করা থেকে দূরে রাখে এবং সত্যের বাণী শোনার পরিবর্তে কানে তালা দিয়ে রাখে।

সুতরাং, কানের সিয়াম হলো অশ্লীল কথা-বার্তা, গান-বাজনা ও নোংরা আলোচনা শোনা থেকে বিরত থাকা। আর পুণ্যবানদের সবচেয়ে বড় সিয়াম হলো, আল্লাহ ক্রুদ্ধ হতে পারেন এমন যে-কোনো কিছু শোনা থেকে রামাদান ও রামাদান পরবর্তী সময়ে বিরত থাকা।

আল্লাহ মানুষকে অঙ্গা-প্রত্যঙ্গা দিয়ে যে-অনুগ্রহ করেছেন, তার ব্যাপারে অনেক মানুষ অবহেলা করে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

---

[১] সূরা ইসরা, আয়াত : ৩৬

Contents

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

অনেক জিন ও ইনসানকে আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য। তাদের অন্তর আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা দেখে না। তাদের কান আছে, কিন্তু তা দ্বারা শোনে না। তারা হলো চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তারা এর চেয়েও নির্বোধ। উপরন্তু তারাই হলো গাফিল।[১]

হ্যাঁ, তাদের কান আছে, তারা পারস্পরিক কথাবার্তা শোনে; কিন্তু উপদেশ গ্রহণের জন্য, হৃদয়ের গভীরে উপলব্ধি জাগ্রত করার জন্য কিংবা মহাসত্য নিয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হওয়ার জন্য শোনে না। তাদের শোনা পুরোপুরি জন্তু-জানোয়ারের শোনার মতো। এতে না আছে কোনো উপদেশ বা শিক্ষা গ্রহণ, না আছে কোনো উপকার বা লাভ। এদের সম্পর্কেই মহান আল্লাহ বলেন—

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

হে রাসূল, আপনার কি মনে হয়, তাদের অধিকাংশ লোক শোনে কিংবা উপলব্ধি করে? না, তারা তো চতুষ্পদ জানোয়ারের মতো; বরং তার চেয়েও পথভ্রষ্ট।[২]

একশ্রেণির মানুষ আছে, যারা হারাম গান-বাদ্য, অশ্লীল কথা-বার্তা ও অহেতুক আলাপ-আলোচনা শুনতে শুনতে তাদের কানের প্রাকৃতিক শ্রবণশক্তি নষ্ট করে ফেলেছে। ফলে কুরআন তিলাওয়াত ও সদুপোদেশ এখন তাদের কানে যায় না। অথচ এই কুরআন তিলাওয়াত শোনা শরয়ী কাজ। নববী আদর্শ ও শ্রবণযন্ত্রের ন্যায্য অধিকার।

অধিকন্তু কুরআন শ্রবণ করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়, দুশ্চিন্তা ও বিকৃত ধ্যান-ধারণা দূরীভূত হয়, শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, হৃদয়ে প্রশান্তির মৃদু সমীরণ বয়ে যায়, অন্তর হিদায়াতের আলোয় উদ্ভাসিত হয়, জ্ঞানসত্তা প্রশান্ত ও পরিতৃপ্ত হয়—সর্বোপরি ইহকাল ও পরকালের সাফল্য নিশ্চিত হয়।

---

[১] সূরা আরাফ, আয়াত : ১৭৯

[২] সূরা ফুরকান, আয়াত : ৪৪

অতএব, কানের সবচেয়ে উপযোগী ও উপকারী খোরাক হলো—কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর যিকির, উপকারী জ্ঞান, সুন্দর উপদেশ এবং প্রয়োজনীয় শিষ্টাচার ও শিক্ষামূলক ঘটনা শ্রবণ করা।

আবু হাতেম থেকে জায়্যিদ সনদে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ মদীনায় একজন বৃদ্ধার বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার দরজার বাইরে থেকে তিলাওয়াত শুনতে পান। বৃদ্ধা সূরা গাশিয়ার নিম্নোক্ত আয়াতটি বারবার তিলাওয়াত করছিলেন—

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

তোমার কাছে আচ্ছন্নকারী কিয়ামতের সংবাদ পৌঁছেছে কি?[১]

বৃদ্ধা এই আয়াতটি বারবার তিলাওয়াত করছিলেন আর কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন। রাসূল ﷺ তার পড়া শুনতে লাগলেন এবং তার পড়ার সাথে সাথে বারবার বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে, হ্যাঁ, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে।'[২]

আল্লাহ তাআলা মনোযোগ দিয়ে কুরআন শোনার কারণে একদল লোকের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন—

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

রাসূলের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন তারা শোনে, তখন তারা যে-সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছে, এ কারণে তাদের চক্ষুগুলো অশ্রু-বিগলিত দেখবে।[৩]

উল্লেখ্য যে, এভাবে যারা মনোযোগে কুরআন তিলাওয়াত শোনে তারাই কুরআনের প্রকৃত কল্যাণ ও বরকত লাভ করে।

---

[১] সূরা গাশিয়া, আয়াত : ০১

[২] *তাফসীর, ইবনু আবি হাতিম* : ১৯২১০

[৩] সূরা মায়িদা, আয়াত : ৮৩

Contents

যারা প্রকৃত অর্থেই সিয়াম পালন করে, কুরআন তিলাওয়াত শুনলে তাদের কানে যেন মধু বর্ষণ হয়; হৃদয়ে প্রশান্তির হিমেল হাওয়া বয়ে যায়। পক্ষান্তরে সিয়ামের নামে যারা শুধু উপবাস যাপন করে, তাদের কাছে কুরআন তিলাওয়াত দুঃসহ মনে হয়; কুরআন তিলাওয়াত শুনলে তাদের নষ্ট অন্তরগুলো বিষাদে ছেয়ে যায়।

উপরন্তু কোনো মুসলিমের শ্রবণযন্ত্র যখন পাপকথাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয় তখন তা ভেতরে গিয়ে হৃদয়-ভূমিকে বিরাণ করে। সংকল্পের সুদৃঢ় প্রাচীর গুড়িয়ে দেয় এবং জ্ঞানসত্তা ও সুকুমারবৃত্তিগুলো বিনষ্ট করে ফেলে। নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত দুই শ্রেণির অবস্থা নিয়ে একটু চিন্তা করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন—

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ۝

যখন কোনো সূরা নাযিল হয়, তখন তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলে, এই সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বৃদ্ধি করল? যারা ঈমান এনেছে, তা তাদেরই ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা এতে আনন্দিত হয়। আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তাদের কলুষতার সাথে আরও কলুষতা যুক্ত করে দেয় এবং তারা কাফির অবস্থায় মারা যায়।[১]

পূর্বোক্ত আলোচনা ও উদ্ধৃত আয়াত থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, সত্য কথা শ্রবণ করলে সত্যের ওপর অটল থাকার ইচ্ছা-শক্তি বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে বাতিল ও ভ্রান্ত কথা শ্রবণ করলে অন্তরে বাতিলের প্রভাব সৃষ্টি হয়। কাজেই মুসলমানদের অপরিহার্য কর্তব্য হলো, আল্লাহপ্রদত্ত শ্রবণশক্তিকে বিশেষ নিয়ামত হিসেবে গণ্য করা। এর জন্য শুকরিয়া আদায় করা এবং রবের সন্তুষ্টির কাজে এই নিয়ামত ব্যবহার করা। সেই সঙ্গে বেশি বেশি যিকির, তিলাওয়াত ও জ্ঞানমূলক আলোচনা শোনা এবং হারাম গান-বাদ্য, অশ্লীল কথা-বার্তা ও অহেতুক গল্প-গুজব শোনা থেকে বিরত থাকা। যারা এগুলো করতে পারে তাদের প্রশংসা করে মহান আল্লাহ বলেন—

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

---

[১] সূরা তাওবা, আয়াত : ১২৪-১২৫

যখন তারা অসার কথা-বার্তার পাশ দিয়ে অতিক্রান্ত হয়, তখন তারা নিজেদের সম্মান বজায় রেখে ভদ্রভাবে চলে যায়।[১]

তিনি আরও বলেন—

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ

যখন তারা অসার কথা শুনতে পায়, তখন তা উপেক্ষা করে চলে যায় এবং বলে আমাদের কর্মের প্রতিফল আমাদের জন্য আর তোমাদের কর্মের প্রতিফল তোমাদের জন্য। তোমাদের ওপর সালাম। আমরা মূর্খদের সঙ্গ চাই না।[২]

আল্লাহ তাআলা আমাদের সেই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা কথা শ্রবণ করে এবং তার মধ্য থেকে উত্তম কথাটি মেনে চলে।

[১] সূরা ফুরকান, আয়াত : ৭২

[২] সূরা কাসাস, আয়াত : ৫৫

পেটের সিয়াম

খাবার হালাল হোক কিংবা হারাম—মানুষের জীবন, চরিত্র ও আচার-আচরণে এর বিরাট প্রভাব পড়ে। এ কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার রাসূলগণকে আদেশ দিয়ে বলেন—

كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

হে রাসূলগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু আহার করো এবং সৎকর্ম করো।[১]

সাধারণ মুমিনদের সম্বোধন করে বলেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদের যে-সকল পবিত্র বস্তু দিয়েছি, তোমরা সেগুলো থেকে আহার করো এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো—যদি তোমরা কেবল তারই ইবাদাত করে থাকো।[২]

---

[১] সূরা মুমিনূন, আয়াত : ৫১

[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৭২

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে পবিত্র বলে ওই সকল বস্তুকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মহান আল্লাহ তার রাসূলের যবানীতে হালাল করেছেন। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন—

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে হালাল আর অপবিত্র বস্তুসমূহকে হারাম ঘোষণা করেন।[১]

অতএব, পেটের সিয়াম হলো, হারাম খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি রামাদান-দিবসে পানাহার এবং সিয়াম ভঙ্গকারী অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকা। কাজেই রামাদানের সিয়াম পরিপূর্ণ করতে হলে অবশ্যই পেটের সিয়াম পালন করতে হবে। সাহরী-ইফতার ও অন্যান্য সময়ে হারাম খাবার বর্জন করতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সিয়াম পালনকারী তো বটেই; সাধারণ একজন মুসলিমও সুদ খেতে পারে না। ঘুষ গ্রহণ করতে পারে না। কারণ, এতে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। কুরআনে কারীমে অবতীর্ণ হয়েছে—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

হে ঈমানদারগণ, তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না।[২]

অন্যত্র অবতীর্ণ হয়েছে—

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

আর আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।[৩]

[১] সূরা আরাফ, আয়াত : ১৫৭

[২] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৩০

[৩] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৭৫

আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে সহীহসূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—

"

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

মহান আল্লাহ সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদীচুক্তি লিপিবদ্ধকারী এবং এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দানকারীদের অভিসম্পাত করেছেন। আর বলেছেন, পাপের ক্ষেত্রে তারা সবাই সমান।[১]

সুদগ্রহীতা অবৈধ উপায়ে রাতারাতি পয়সা উপার্জন করে খুবই আহ্লাদিত হয়। শেষ বয়সে এসে অথবা বড় ধরনের কোনো বিপদে পড়লে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। অথচ হারাম খেয়ে সে নিজেই তার প্রার্থনা কবুলের পথগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। সুদখোরের এই ভয়াবহ পরিণতি নিম্নোক্ত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

"

ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟!

দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত, উস্কোখুস্কো চুল ও ধূলিমলিন চেহারার জনৈক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে নবী ﷺ বলেন, এত কষ্ট করে লোকটি আকাশের দিকে দুহাত তুলে কাতর স্বরে 'আল্লাহ-আল্লাহ' বলে ডাকছে। (কিন্তু আল্লাহ কিছুতেই তার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না।) কারণ, তার খাবার হারাম। পানীয় হারাম। এক কথায়, সে হারাম খেয়েই বেড়ে উঠেছে। সুতরাং, কীভাবেই বা তার দুআ কবুল হবে?[২]

হাদীসে যে লোকটির কথা বলা হয়েছে, সে অত্যন্ত বড় মাপের আবিদ ও ইবাদাতগুজার ছিল; কিন্তু সে উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের বিবেচনা করত না। পানাহারের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করত না। তাই তার দুআ কবুল হয়নি।

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ১৫৯৮

[২] *সহীহ মুসলিম* : ১০১৫

কাজেই আমরা যদি চাই যে, আমাদের দুআ ও ইবাদাত আল্লাহর দরবারে কবুল ও গ্রহণযোগ্য হোক তবে অবশ্যই আমাদের পেটের সিয়াম পালন করতে হবে। আর এটা বলাবাহুল্য যে, সুদ-ঘুষ, চুরি-ছিনতাই এবং ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করলে অথবা অন্য কোনো হারাম উপায়ে অর্জিত খাবার দ্বারা সাহরী-ইফতার করলে কিছুতেই পেটের সিয়াম পালিত হবে না।

আল্লাহর কসম! মানুষের খাবার-পানীয়-এর মধ্যে হারামের অনুপ্রবেশ ঘটলে তার চিন্তা-চরিত্র ও রুচিবোধ পাল্টে যায়। হৃদয় কলুষিত হয় এবং ঈমানের নূর নির্বাপিত হয়। এ প্রসঙ্গে আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি ঘটনা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—

> *একদিন তিনি খাদেমের দেওয়া খাবার খেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এই খাবার কোথায় পেলে? উত্তরে খাদেম বলেন, জাহেলী যুগে আমি গণকবৃত্তি করতাম। সেই পেশার উপার্জিত অর্থ দিয়েই এই খাবারের ব্যবস্থা করেছি। এ কথা শোনার সাথে সাথে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু গলার ভেতর হাত দিয়ে বমি করে সেই খাবার বের করে দেন। তাঁর এই নিষ্ঠা ও শুচিতায় মহান আল্লাহ তার প্রতি অত্যন্ত খুশি হন।*[১]

উল্লেখ্য যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে এতটা নিষ্ঠা ও শুচিতার পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়েছে—কারণ, তিনি জানতেন, খাবারের প্রতিটি গ্রাস মানবদেহে শক্তি ও পুষ্টি যোগায়। এই খাবার হারাম হলে শক্তি ও পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা ও চরিত্রেও কুপ্রভাব ফেলে। আর যে-দেহ হারাম খেয়ে বেড়ে ওঠে, জাহান্নামই তার একমাত্র ঠিকানা।

আমাদের সালাফে সালেহীনগণও খাবারের এই প্রভাবের কথা জানতেন। তাই তারা খাবার গ্রহণ করার পূর্বে তার উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন। হালাল হলে গ্রহণ করতেন; অন্যথায় বর্জন করতেন। এ কারণে তাদের রুচিবোধ ছিল উন্নত। চেতনা ছিল স্বচ্ছ। দেহ ছিল সুস্থ। হৃদয় ছিল উজ্জ্বল আভায় উদ্ভাসিত। পরবর্তীদের মাঝে যখন খাদ্য-সচেতনতা হ্রাস পায় এবং উপার্জনের হালাল-হারাম বিচারের প্রবণতা কমে যায় তখনই তাদের চিন্তা ও চরিত্রে বিকার শুরু হয় এবং অন্তর থেকে হিদায়াতের নূর নিভে যায়।

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৩৮৪২

Contents

এদিকে লক্ষ করেই আল্লাহর রাসূল ﷺ অবৈধ উপায়ে উপার্জিত কাড়ি কাড়ি টাকার চেয়ে, গায়ে খেটে বৈধ উপায়ে উপার্জিত সামান্য পয়সাকেও শ্রেষ্ঠ বলেছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

“

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

মানুষের নিজ হাতে উপার্জিত অর্থের খাবারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো খাবার নেই। আল্লাহর নবী দাঊদ আলাইহিস সালামও নিজ হাতের উপার্জন খেতেন।[১]

উল্লেখ্য যে, দাঊদ আলাইহিস সালাম কর্মকার ছিলেন। যাকারিয়া আলাইহিস সালাম কাঠমিস্ত্রি ছিলেন। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শৈশবে রাখাল ও যৌবনে ব্যবসায়ী ছিলেন। এছাড়াও সকল নবী জীবনের কোনো-না-কোনো সময় মেষ চরিয়েছেন। নবীদের এই নানবিধ কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মূলত মানুষকে হালাল উপার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে; অধিকন্তু মহান আল্লাহ বলেন—

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

তোমরা ইয়াতীমদের সম্পদের কাছেও যাবে না। তবে যদি তোমাদের উদ্দেশ্য সৎ হয় তাহলে যেতে পারো।[২]

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের মাল ভক্ষণ করে, তারা মূলত জাহান্নামের আগুন দিয়ে উদর পূর্ণ করে। অচিরেই তারা প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করবে।[৩]

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ১৯৮৮

[২] সূরা আনআম, আয়াত : ১৫১

[৩] সূরা নিসা, আয়াত : ১০

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কোরো না এবং মানুষের সম্পদের কিয়দাংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করবার মানসে বিচারকগণের কাছে পেশ কোরো না।[১]

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

যারা সুদ খায় তারা কিয়ামতের দিন ওই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে—শয়তান যাকে স্পর্শ করে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলেছে।[২]

রাসূল ﷺ থেকে সহীসূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—

“

لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وفى رواية-الرَّائِشَ

ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতাকে মহান আল্লাহ অভিসম্পাৎ করেন।[৩]

বিপথগামী ইহুদী-খ্রিস্টানদের মন্দস্বভাবের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন—

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

তাদের মধ্যে অনেককে দেখবে, তারা অবাধ্যতা, সীমালঙ্ঘন এবং হারাম ভক্ষণের কাজে প্রতিযোগিতা করছে। তারা যে কাজ করে, তা কতই না নিকৃষ্ট![৪]

আল্লামা ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ তদীয় *সায়দুল খাতির* গ্রন্থে বলেন—

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৮

[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৭৫

[৩] *জামি তিরমিযী* : ১৩৩৭; *সুনানু আবি দাউদ* :৩৫৮০

[৪] সূরা মায়িদা, আয়াত : ৬২

> **একবার তিনি সন্দেহযুক্ত খাবার মুখে তুলতেই তার মধ্যে নেতিবাচক ভাবান্তর ঘটে। কিছু সময়ের জন্য হৃদয় তমাসাচ্ছন্ন হয়ে যায়।**

তাদের হৃদয় স্বচ্ছ থাকার কারণে তারা এই আত্মিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলো বুঝতে পারতেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুযোগ পেতেন; কিন্তু বর্তমানে অবস্থা অনেক পাল্টে গেছে। অনবরত হারাম ভক্ষণের কারণে আমাদের হৃদয় কলুষে ভরে গেছে। অনুভূতিগুলো ভোতা হয়ে গেছে। তাই ভেতরের নেতিবাচক পরিবর্তনগুলো আমাদের চোখে পড়ে না।

অনেকেই মদসহ নানা ধরনের মাদক গ্রহণ করে। ফলে তারা মহান আল্লাহর ইবাদাতের স্বাদ ও তাঁর আনুগত্যের তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তায় তাদের জীবন ছেয়ে যায়। সর্বোপরি তারা দুআ কবুলের মহাসৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত হয়।

অতএব, হে সিয়াম পালনকারী শোনো, স্থিতিশীল নিরাপদ জীবন ও দুআ কবুলের সৌভাগ্য পেতে হলে অবশ্যই পেটের সিয়াম পালন করতে হবে। হারাম খাবার থেকে উদরকে পুত-পবিত্র রাখতে হবে। সুতরাং, আছে কি কোনো সিয়াম পালনকারী—যে তার রসনাকে হারাম থেকে দূরে রাখবে? উদরকে হারাম থেকে পবিত্র রাখবে?

হে আল্লাহ, তুমি আমাদের সেই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করো—যারা শরীয়তের হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম মনে করে।

সিয়াম পালনকারী যে-সকল ভুল করে থাকে

অনেক সিয়াম পালনকারী দ্বীনের সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে সিয়ামের ক্ষেত্রে অনেক ভুল করে থাকে। তারা জানে না, কীসে সিয়াম নষ্ট হয় আর কীসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনুরূপ তারা এটাও জানে না যে, সিয়াম পালনকালে কোনটা তার জন্য সুন্নাত, কোনটা জায়েয, কোনটা ওয়াজিব, আর কোনটা হারাম?

অথচ মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে সহীহ সনদে প্রমাণিত, তিনি বলেন—

"

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে তিনি দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।[১]

হাদীসের ভাষ্যমতে প্রতীয়মান হয়, যে-ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে না কিংবা ধর্মীয় বিষয়াবলি কারও কাছ থেকে জেনে নেয় না, তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো কল্যাণ বরাদ্দ নেই।

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ১৭; *সহীহ মুসলিম* : ১০৩৭

অধিকন্তু আল্লাহ সুবহানাহু তার বান্দাদের জ্ঞান আহরণের নির্দেশ দিয়ে বলেন—

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

যদি তোমরা না জানো, তবে জ্ঞানীদের কাছ থেকে জেনে নাও।[১]

উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত আয়াতে বর্ণিত 'আহলুয যিকির' বলে আলেমদের বোঝানো হয়েছে। সুতরাং, যে মুসলিম যথাযথভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে চায়, তার জন্য জরুরী হলো, দ্বীনের যে-সকল বিষয় তার অজানা, সে-সম্পর্কে জেনে নেওয়া, ধর্মীয় বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জন করা এবং অজ্ঞতাগুলো দূর করা।

রামাদানে অনেক সিয়াম পালনকারী এমন পাপকর্মে লিপ্ত হয়, যা তাদের সিয়াম-কিয়াম বরবাদ করে দেয়। যেমন—গীবত, পরনিন্দা, চোগলখুরি, অশ্লীল কথা-বার্তা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, অন্যায় অভিশাপ—ইত্যাদি। 'জিহ্বার সিয়াম' অংশে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

রামাদানে সবচেয়ে মারাত্মক যে-ভুলটি কমবেশি সবাই করে থাকে সেটা হচ্ছে খাবারের অপচয়। কারণ, সাহরী ও ইফতারে প্রায় ঘরেই দুই-চারজন মানুষের জন্য পাঁচ-দশ পদের খাবারের ব্যবস্থা করতে দেখা যায়। এতে ফল যা হবার তাই হয়। কিছু অংশ খাওয়ার পর বাকি অংশ ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়। অথচ তারা চাইলে এই খাবার দিয়ে-ই ছোটবড় একাধিক পরিবারের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারত এবং তাদের জন্য তৃপ্তিদায়ক সাহরী ও ইফতারের ব্যবস্থা করতে পারত। মহান আল্লাহ অপচয়কে ইসলামের নীতি-বিরুদ্ধ ঘোষণা করে বলেছেন—

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

আর তোমরা খাও এবং পান করো; কিন্তু অপচয় কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না।[২]

[১] সূরা নাহল, আয়াত : ৪৩

[২] সূরা আরাফ, আয়াত : ৩১

উপর্যুক্ত আয়াত থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষের মৌলিক চাহিদা ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করা ঘৃণিত ও নিষিদ্ধ অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত। ফলে এজাতীয় অপচয়ে মহান আল্লাহ ভীষণ রুষ্ট হন এবং অপচয়কারীকে হতভাগ্য শয়তানের অনুচর হিসেবে পরিগণিত করেন। কুরআনের ভাষায়—

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝

তোমরা অপচয় কোরো না। কারণ, অপচয়কারীগণ শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।[১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপচয় যেমন করে না তেমনই কৃপণতাও করে না; বরং তাদের ব্যয় হয় এতদুভয়ের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ।[২]

রামাদান মাস এলেই দেখা যায়, হাট-বাজার ক্রেতায় ভরে যায়। প্রত্যেকেই এত বেশি খাদ্য-পানীয় ক্রয় করে, যা স্বাভাবিক অবস্থায় দশটি-দশটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট। অথচ তাদের প্রতিবেশী কত পরিবার ক্ষুধার জ্বালায় মারা যাচ্ছে। এক টুকরো বাসি রুটি দিয়ে সাহরী-ইফতার সেরে নিচ্ছে। মাথা গোঁজার ঠাঁই না পেয়ে রাজ্যের ক্ষুধা নিয়ে ফুটপাতে শুয়ে পড়ছে।

সিয়ামের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হলো, কম খাওয়ার মাধ্যমে পাকস্থলীর দূষিত পদার্থসমূহ বের করে দেওয়া। যারা খাদ্য-পানীয়-এর ক্ষেত্রে এত বেশি অপচয় করে এবং প্রয়োজন বা সাধ্যের অতিরিক্ত খাওয়ার চেষ্টা করে তাদের কি আদৌ এ উদ্দেশ্য অর্জিত হবে?

[১] সূরা ইসরা, আয়াত : ২৬-২৭

[২] সূরা ফুরকান, আয়াত : ৬৭

এমন সিয়াম পালনকারীর সংখ্যাও কম নয়, যারা সারাটা দিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। তাদের দেখে মনে হয়, তারা যেন সিয়ামই রাখেনি। অনেকে তো শুধু সালাতের সময় জাগে। সালাত পড়েই আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এভাবে ঘুম ও অবহেলায় সারা দিন পার করে দেয়। আর সারা রাত আমোদ-প্রমোদে মেতে থাকে।

অধিকন্তু সিয়ামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হিকমত ও উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণার স্বাদ আস্বাদন করা। যারা সারাটা দিন ঘুমের ঘোরে কাটিয়ে দেয়, তারা কি সেই আস্বাদ অনুভব করতে পারে?

অনেক সিয়াম পালনকারী আবার সারা দিন মাকরুহ বা হারাম খেলা-ধুলায় মত্ত থাকে। যেমন—দাবা, পাশা, তাস, ফুটবল—ইত্যাদি। তারা এসব খেলাকে আত্মপ্রশান্তির কারণ ও আনন্দময় অবকাশ যাপনের মাধ্যম মনে করে। তাদের এই ক্রিয়া-কর্মের ব্যাপারে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন—

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

তোমরা কি মনে করো যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি, আর তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না?[১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

আপনি তাদের কথা ছেড়ে দিন, যারা তাদের দ্বীনকে খেল-তামাশার বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং যাদের পার্থিব জীবন প্রবঞ্চিত করেছে।[২]

অনেক সিয়াম পালনকারী অযথা রাত্রি-জাগরণ করে। অনর্থক খেল-তামাশায় সময় নষ্ট করে। শপিংমল, রাস্তা-ঘাট ও পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়; কিন্তু দুই মিনিট সময় ব্যয় করে দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করে না। অনেকে তো আবার এরচেয়েও

[১] সূরা মুমিনূন, আয়াত : ১১৫

[২] সূরা আনআম, আয়াত : ৭০

মারাত্মক ভুল বা অপরাধে লিপ্ত হয়। সামান্য ও তুচ্ছ কারণে জামাআতে সালাত আদায় করা থেকে পিছিয়ে থাকে। অথচ তারা নিজেরাও হয়তো জানে, এটা স্পষ্ট মুনাফিকের আলামত এবং অন্তরের ব্যাধির আলামত ও আত্মার অপমৃত্যুর প্রমাণ।

এমন সিয়াম পালনকারীর সংখ্যাও একেবারে কম নয়, রামাদানে কুরআনে কারীমের সঙ্গে যাদের দূরতম সম্পর্কও থাকে না। জাগতিক অনেক কিছুই হয়তো পড়ে; কিন্তু একটিবারের জন্যও কুরআন খুলে দেখার সময় পায় না। অনেকে আবার এমনও আছে, এই দয়া ও উদারতার মাসেও যাদের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হয় না। ভেতরে সাদাকার প্রেরণা জাগে না। এ কারণে তাদের দস্তরখানে অন্য সিয়াম পালনকারীর সাহরী বা ইফতারের আয়োজন লক্ষ করা যায় না; বরং অভাবীদের জন্য তাদের গৃহ ও হৃদয়ের দুআর সব সময় বন্ধ থাকে। তাদের এই মানসিকতার নিন্দা করে মহান আল্লাহ বলেন—

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ

তোমাদের কাছে যা আছে, তা শেষ হয়ে যাবে; কিন্তু আমার কাছে যা আছে তা চিরদিন বাকি থাকবে।[১]

তিনি আরও বলেন—

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ

তোমরা নিজেদের জন্য কল্যাণকর যা-কিছু অগ্রে প্রেরণ করবে, তা তোমরা আল্লাহর কাছে পাবে।[২]

অনেক সিয়াম পালনকারী অলসতা করে তারাবীহ সালাত ছেড়ে দেয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তারা যেন বলতে চায়, 'ফরয আদায় করাই তো যথেষ্ট'। অথচ দ্বীনের ক্ষেত্রে এই অল্পেতুষ্ট লোকগুলোই দুনিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু মোটেও অল্পে তুষ্ট হয় না; বরং সব সময় উন্নতি ও সমৃদ্ধির চিন্তায় বিভোর থাকে।

---

[১] সূরা নাহল, আয়াত : ৯৬

[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ১১০

অনেক সিয়াম পালনকারী স্ত্রী বা পরিবারের অন্যান্য নারীদের বিভিন্ন ধরনের খাবার-পানীয় প্রস্তুত করার আদেশ দিয়ে এতটাই ব্যতিব্যস্ত রাখে যে, আগ্রহ থাকলেও তারা কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর যিকির এবং অন্যান্য নফল ইবাদাত পালনের অবসরই পায় না। অথচ পরিবারের কর্তাব্যক্তিগণ যদি সাহরী ও ইফতারের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় খাবার তৈরিই যথেষ্ট মনে করত, তাহলে পরিবারের নারী সদস্যরা আল্লাহর ইবাদাত ও দুআ-মুনাজাতের মাধ্যমে আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের সুযোগ পেত।

হে আল্লাহ, তুমি আমাদের নিয়ামত বাড়িয়ে দাও; কমিয়ে দিয়ো না। আমাদের দান করো, বঞ্চিত কোরো না। আমাদের সম্মানিত করো, অপমানিত কোরো না। আমাদের প্রতি দয়া করো। নির্দয় হয়ো না। আমাদের ক্ষমা করো। শাস্তি দিয়ো না।

Contents
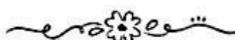
রামাদানের স্মরণিকা

- মুসলিমদের জন্য রামাদানে সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা হলো—এ মাসে আমাদের জন্য মহাগ্রন্থ—আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন—

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

রামাদান মাস, এতে মানুষের হেদায়াত এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।[১]

সুতরাং, কুরআন অবতীর্ণ হওয়াই রামাদানের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা।

- কুরআন নাযিল হয়েছে একটি অশিক্ষিত ও অবিশ্বাসী জাতিকে অশিক্ষা ও অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনার জন্য।

- প্রতিবারই রামাদান আমাদের বিজ্ঞানময় কুরআনের সুমহান নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যে-কুরআন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে—

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৫

Contents

এতে কোনো মিথ্যা অনুপ্রবেশ করতে পারে না। সামনে হতেও না, পেছনের দিক থেকেও না। কারণ, তা প্রজ্ঞাময় ও প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।[১]

- এই রামাদান মাসেই আমারা বদর-প্রান্তরে মহান আল্লাহর সীমাহীন সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি। বাতিলের ওপর বিজয়ী হয়েছি এবং কুফরীশক্তিকে পরাভূত করেছি।
- আমাদের রাসূল এবং তার মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণও এ মাসেই বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন বদরের প্রান্তরে যখন তোমরা ছিলে দুর্বল। সুতরাং, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। তবেই তোমরা সফলকাম হবে।[২]

- রামাদান মাসেই ইসলাম কুফরীশক্তির ওপর বিজয়ী হয়েছিল। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ'—এর কালিমা সমুন্নত হয়েছিল এবং এ মাসেই আল্লাহদ্রোহী শক্তির পতন ঘটেছিল। মহান আল্লাহ বলেন—

يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ

যেই দিন দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল।[৩]

- ঐতিহাসিক বদরযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এই মাসেরই ১৭ তারিখে। তাই প্রতিবারই এই দিনটি আমাদের বদরের মহিমান্বিত বিজয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়।
- ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ও এ মাসেই সংঘটিত হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন—

---

[১] সূরা ফুসসিলাত, আয়াত : ৪২

[২] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১২৩

[৩] সূরা আনফাল, আয়াত : ৪১

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দান করেছি সুস্পষ্ট বিজয়।[১]

- আমাদের রাসূল ﷺ রামাদান মাসে কুরআন দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করেছেন। তাওহীদ ও একাত্মবাদের মাধ্যমে মক্কা জয় করেছেন। ফলে ঈমান বিজয়ী হয়েছে। কুরআনের বাণী সমুন্নত হয়েছে। আল্লাহর দল অমরত্ব লাভ করেছে; অধিকন্তু ইসলামী ইতিহাসের বড় বড় ঘটনা ও উল্লেখযোগ্য বিজয়সমূহ এ মাসেই সংঘটিত হয়েছে।

- রামাদানের স্মরণীয় আরেকটি দিক হলো, এ মাসে ওহী-বাহক জিবরীল আলাইহিস সালাম আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে অনেক বেশি আসতেন। তাকে পবিত্র কুরআন পড়ে শোনাতেন এবং নিজেও তার তিলাওয়াত শুনতেন। তার স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করতেন। তার সাথে জ্ঞানগর্ভ কুরআনের আয়াত নিয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হতেন।

- এ মাসের আরেকটি স্মরণীয় দিক হলো, ইসলামী ইতিহাসের প্রথম সারির ব্যক্তিগণ এ-মাসে তারাবীহ-সালাতে উপস্থিত হতেন। তারা একজন ইমামের অধীনে সালাতে কুরআন তিলাওয়াত শুনতেন। ইমাম তাদের সামনে মহান রবের বাণী তিলাওয়াত করতেন। এতে তাদের অন্তর বিগলিত হতো। তারা কান্নায় ভেঙে পড়তেন এবং আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন।

এ মাসে তারা সালাত-ইবাদাতে এতটাই নিমগ্ন থাকতেন যে, সুদীর্ঘ রাতও তাদের কাছে সংক্ষিপ্ত মনে হতো। রুকু, সিজদা, যিকির, তিলাওয়াত এবং বিনম্র প্রার্থনায় নিমিষেই রাত কেটে যেত। তাদের চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরত। হৃদয় বিগলিত হতো। সারা দেহে শিহরন ছড়িয়ে পড়ত।

- রামাদান মাসের আরেকটি স্মরণীয় দিক হলো, এ মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়। সবচেয়ে আনন্দের কথা হলো, মুমিন বান্দা অনুভব করতে পারে যে, এই মহান মাসে সে রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় পাচ্ছে এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকছে।

---

[১] সূরা ফাতাহ, আয়াত : ০১

এছাড়াও প্রত্যেক সিয়াম পালনকারীর জন্য এই মাসে দুটি আনন্দের বিষয় আছে। একটি হলো ইফতারের সময়। অপরটি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার সাথে সাক্ষাতের সময়। তাই যখনই নতুনভাবে এই মাসের আগমন ঘটে, তখনই সাথে করে খুশির এই বার্তা নিয়ে আসে; আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় আমাদের মন ভরিয়ে দেয়।

- পরবর্তী রামাদান পূর্ববর্তী রামাদানের অন্তর্বর্তী গুনাহের জন্য কাফ্‌ফারা বা ক্ষমার উপলক্ষ্য হয়। বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা রামাদানের এই ফযীলত প্রমাণিত। সুতরাং, রামাদান হলো গুনাহ মাফের মাস। গুনাহমুক্ত জীবন-যাপনের প্রশিক্ষণলাভের মাস।
- রামাদান হলো ইয়াতীম, অসহায় ও অভাবীদের আনন্দের মাস। কারণ, এ মাসে তারা ধনীদের পক্ষ থেকে সাদাকার হাদিয়া পায়। বিভিন্ন কাজে তাদের সাহায্য পায়। তাই এই মাসে দাতাশ্রেণির হাত ধরে অনেক অভাবী সচ্ছলতার মুখ দেখে।

অধিকন্তু রামাদানে সিয়াম পালনকারীদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেন—

“

إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يدْخُلُ مِنْهُ الصَّائمونَ يومَ القِيامةِ، لاَ يدخلُ مِنه أَحدٌ غَيرهُم، يقالُ: أَينَ الصَّائمُونَ؟ فَيقومونَ لاَ يدخلُ مِنهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فإذا دَخَلوا أُغلِقَ فَلَم يدخلْ مِنْهُ أَحَدٌ

জান্নাতে বিশেষ একটি দরজা আছে, তার নাম ‘রাইয়্যান’। এই দরজা দিয়ে কেবল সিয়াম পালনকারীগণই প্রবেশ করবে। তাদের প্রবেশ করা শেষ হয়ে গেলে দারজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। সেখান দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।[১]

সুতরাং, বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহর বান্দাদের কাছে রামাদান ও ‘রাইয়্যান’ ফটকের গুরুত্ব অপরিসীম।

হে আল্লাহ, তুমি আমাদের জীবনে বারবার রামাদানের আগমন ঘটাও এবং অনবরত পাপমুক্তি ও পুণ্যলাভের সুযোগ দাও।

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ১৮৯৬; *সহীহ মুসলিম* : ২০৩১

Contents

রামাদান : তাওবা ও গুনাহ মাফের সুবর্ণ সুযোগ

এই মোবারক মাস মুমিনদের জন্য যে-সকল কল্যাণ বয়ে আনে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো আল্লাহর কাছে তাওবা করার, তাঁর অভিমুখী হওয়ার এবং অতীতের সমস্ত গুনাহের কথা স্মরণ করে তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করার অবারিত সুযোগ।

এ মাসে তাওবার দরজা সব সময় খোলা থাকে। আল্লাহর দান ও দয়া বর্ষিত হতে থাকে। পাপীদের অভয় দিয়ে ঘোষণা করা হতে থাকে—আছে কি কোনো তাওবাকারী? আছে কি কোনো ক্ষমাপ্রার্থনাকারী? আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

হে রাসূল, আপনি বলে দিন, হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু।[১]

এই মাস তাওবা ও ক্ষমার মাস। বদান্যতা ও অনুগ্রহের মাস। এই মাসের প্রতিটি মুহূর্ত অন্যান্য মাসের চেয়ে অধিক মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। আবু মূসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে তাওবা ও ক্ষমার চিত্র তুলে ধরে

[১] সূরা যুমার, আয়াত : ৫৩

আল্লাহর নবী ﷺ বলেন—

"

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

আল্লাহ তাআলা রাতের বেলা স্বীয় হাত প্রসারিত করেন—যেন দিনের অপরাধীরা তাওবা করতে পারে। অনুরূপ দিনের বেলা স্বীয় হাত প্রসারিত করেন—যেন রাতের অপরাধীরা তাওবা করতে পারে। পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকবে।[১]

বস্তুত আমাদের অপরাধ অগণন; কিন্তু তার ক্ষমা অপরিসীম। আমাদের গুনাহ অসংখ্য; কিন্তু তাঁর করুণার তুলনায় একেবারেই নগণ্য। আমাদের পদস্খলন যত্রতত্র; কিন্তু তার ক্ষমার চাদর সর্বত্র।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

(মুত্তাকী তারাই) যারা কোনো পাপ কাজ করে ফেললে অথবা নিজের ওপর যুলুম করলে, আল্লাহকে স্মরণ করে। অতঃপর স্বীয় কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর তিনি ছাড়া পাপ ক্ষমা করতে পারে এমন কে আছে? তারা যে ভুল করে ফেলে, জেনে-শুনে তার পুনরাবৃত্তি করে না।[২]

তারা কখনো পাপের ওপর অটল থাকে না। ভুল করলে ভুল স্বীকার করে। পাপ করলে ক্ষমা প্রার্থনা করে। মন্দ কাজ করলে অনুতপ্ত হয়। ফলে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেন।

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ৫০৮৩

[২] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৫

আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে আবু হুরায়রা রাসূল রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহীহসূত্রে প্রমাণিত, তিনি বলেন—

"

رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ

ওই ব্যক্তি অপদস্থ হোক—যে রামাদান পেয়েও নিজের গুনাহ মাফ করাতে পারে না।[১]

মুমিনের জন্য রামাদান একটি সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগ সব সময় আসে না। অনেকের জীবনে হয়তো এর পুনরাবৃত্তি ঘটে না। সুতরাং, পাপ ক্ষমা করিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী কোনো প্রচেষ্টাকারী আছে কি?

বান্দা যদি আল্লাহর সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে পারে এবং কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে তবে তার প্রতি বছরের পাপ প্রতি বছরেই ক্ষমা করে দেওয়া হবে। সারা বছরের পাপরাশি রামাদানের কল্যাণে ভস্মিভূত হয়ে যাবে।

আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হাদীসে কুদসীতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেছেন—

"

يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ

হে আমার বান্দারা, তোমরা দিন-রাত পাপাচার করো। আমি তোমাদের পাপাচার ক্ষমা করি। সুতরাং, তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব।[২]

অপরাধপ্রবণতা মানুষের সহজাত। তবে অপরাধ করার পর মানুষ দুই শ্রেণিতে ভাগ হয়ে যায়। এক শ্রেণি তাওবা-ইসতিগফার করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে এবং সফল হয়। আরেক শ্রেণি পাপের ওপর অটল থাকে এবং অজ্ঞতা বা অহঙ্কারবশত তাওবা-ইসতিগফার থেকে বিরত থাকে। এই দ্বিতীয় শ্রেণির পাপীরাই হতভাগ্য।

---

[১] *আল আদাবুল মুফরাদ* : ৬৪৬; হাদীসটি তিরমিযীতেও এসেছে

[২] *সহীহ মুসলিম* : ২৫৭৭

সরল পথে চলার সৌভাগ্য বঞ্চিত।

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একটি হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন—

“

يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِيْ

হে আদম-সন্তান, তুমি যতদিন আমাকে ক্ষমার আশায় ডেকে যাবে, আমি ততদিন তোমাকে ক্ষমা করতে থাকব। তোমার অপরাধ যত বেশিই হোক না কেন—আমি তাতে পরোয়া করব না।[১]

সুতরাং, হে সিয়াম পালনকারী, এই মাস আমাদের বিশুদ্ধ তাওবার মাস। এই মাসের প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের জন্য গনীমতস্বরূপ। আমরা কি এই গনীমত লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করব না?

গত বছর যারা আমাদের সাথে সিয়াম পালন করেছে এবং তারাবীহ'র সালাতে অংশ নিয়েছে তাদের অনেকেই হয়তো এ বছর আমাদের মাঝে নেই। নেক আমলগুলো পুঁজি করে এবং দুঃসহ স্মৃতিগুলো আমাদের জন্য ফেলে রেখে তারা মহান পালনকর্তার সান্নিধ্যে গমন করেছেন। বস্তুত তিনি বড়ই ত্বরিৎ হিসেব গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে, সিয়াম কবুলের গুরুত্বপূর্ণ একটি লক্ষণ হলো, বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহর কাছে তাওবা করা। যে-অপরাধের জন্য তাওবা করা হয়েছে সেটার পুনরাবৃত্তি না করার দৃঢ় সংকল্প করা এবং আল্লাহর যে-সকল হক আদায়ে অলসতা হয়েছে, সে-ব্যাপারে অনুতপ্ত হওয়া।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

তিনিই ওই সত্তা, যিনি তার বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করেন। তোমরা যা করো, তা তিনি জানেন।[২]

[১] *জামি তিরমিযী* : ৩৫৪০

[২] সূরা শূরা, আয়াত : ২৫

Contents

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

“

وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ

ওই সত্তার শপথ—যার হাতে আমার প্রাণ! যদি তোমরা কোনো পাপ না করতে, তাহলে আল্লাহ তোমাদের দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতেন এবং তোমাদের পরিবর্তে এমন এক জাতি নিয়ে আসতেন, যারা পাপ করবে অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং তিনি তাদের ক্ষমা করে দেবেন।[১]

কেউ যদি রামাদান মাসেও ক্ষমা না চায়, তাহলে কবে ক্ষমা চাইবে? রামাদানে যদি আল্লাহর দিকে ফিরে না আসে, তবে কবে ফিরে আসবে?

রামাদানে অনেক সিয়াম পালনকারীর মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। যথাসম্ভব সৎকাজ করার চেষ্টা করে। অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে; কিন্তু রামাদান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা আবার আগের মতো হয়ে যায়। রামাদানে অর্জিত পুণ্যগুলো নষ্ট করে ফেলে। সংকল্পগুলো ভঙ্গ করে ফেলে। বাকি জীবনটা এভাবে ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا

তোমরা ওই মহিলার মতো হয়ো না, যে পরিশ্রম করে সুতা পাকাবার পর টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলে।[২]

আমাদের অনেক সালাফ রামাদানের সিয়াম শেষ হয়ে গেলে তার বিচ্ছেদে কাঁদতেন। নিজেদের গুনাহের কথা স্মরণ করে অনুতাপের অশ্রু ঝরাতেন। কারণ, তাদের চিন্তা ছিল স্বচ্ছ। হৃদয় ছিল পবিত্র এবং মন ছিল কলুষমুক্ত।

হে আল্লাহ, তুমি তোমার সৎ বান্দাদের যেভাবে সাহায্য করেছ, আমাদেরও ঠিক সেভাবেই সাহায্য করো এবং আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করো।

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ২৭৪৯

[২] সূরা নাহল, আয়াত : ৯২

রামাদান : ঈমান-বৃদ্ধির মৌসুম

বস্তুত আমল অনুসারে ঈমান বাড়ে ও কমে। আল্লাহর আনুগত্য করলে ঈমান বাড়ে আর অবাধ্যতা করলে কমে। সালাত আদায় করলে বাড়ে, ফিতনা-ফাসাদে জড়ালে কমে। সঠিক পথে চললে বাড়ে, ভুল পথে চললে কমে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ

আর যারা সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে, তিনি তাদের সুপথে চলার প্রেরণা বাড়িয়ে দেন এবং তাদের তাকওয়া দান করেন।[১]

অন্যত্র বলেছেন—

لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ

যেন তাদের ঈমানের সাথে ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়।[২]

রামাদান মাসে বান্দা তার রবের খুব নিকটবর্তী হওয়ায় তার ঈমান বৃদ্ধি পায়, বিশ্বাস প্রগাঢ় হয় এবং তাওহীদের আলোয় হৃদয় উদ্ভাসিত হয়। একারণেই সিয়াম

[১] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ১৭

[২] সূরা ফাতহ, আয়াত : ০৪

অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। বান্দাকে স্রষ্টার নিকটবর্তী করার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এছাড়াও রামাদান বান্দা এবং জাহান্নামের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে। অনুগত মুমিন ও অবাধ্য পাপীর মাঝে পার্থক্য করে।

রামাদান মাসে ইবাদাতের নিমিত্তে রাত্রিজাগরণ মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, ভালোবাসা ও আগ্রহ সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম। কারণ, এতে হৃদয়ের নিফাক ও কপটতা বিদূরিত হয় এবং ঈমানের বৃক্ষ সিঞ্চিত ও ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়।

সুতরাং, আসুন, আমরা এমন কতগুলি আমল সম্পর্কে জেনে নিই, যেগুলো ঈমান বৃদ্ধি করে এবং বিশ্বাসে দৃঢ়তা বাড়ায়—

এক. বিনয়, একাগ্রতা ও খুশূ-খুযূর সাথে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনদের জন্য অবশ্য-কর্তব্য।[১]

জামাআতে সালাত আদায় করলে অন্তর থেকে নিফাক দূর হয়ে যায়, অন্তরে আল্লাহর ভয় সঞ্চারিত হয় এবং অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকা সহজ হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ-কর্ম হতে বিরত রাখে। আর আল্লাহর যিকিরই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা জানেন।[২]

দুই. গভীর মনোযোগের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করা। কুরআনের প্রতিটি শব্দ, বাক্য ও আয়াত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা, কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ১০৩

[২] সূরা আনকাবূত, আয়াত : ৪৫

Contents

সেই শিক্ষা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। মহান আল্লাহ বলেন—

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

এটা এক কল্যাণময় কিতাব, এটা আমি অবতীর্ণ করেছি—যেন লোকেরা এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধসম্পন্ন লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।[১]

তিন. হৃদয়, জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আল্লাহর যিকির করা। তাসবীহ[২], তাকবীর[৩], তাহমীদ[৪] ও তাহলীল[৫] পাঠে জিহ্বা সতেজ রাখা। মহান আল্লাহ বলেন—

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। কৃতঘ্ন হয়ো না।[৬]

অতএব, রামাদানে আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করতে হবে। রাতের শেষ প্রহরে তার কাছে দুআ-মুনাজাত করতে হবে এবং বেশি বেশি ক্ষমা-ভিক্ষা চাইতে হবে।

চার. দ্বীনী ইলম অর্থাৎ ধর্মীয় বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করা। মহান আল্লাহ বলেন—

وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

আর বলুন, হে আমার রব, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন।[৭]

---

[১] সূরা সোয়াদ, আয়াত : ২৯

[২] সুবহানাল্লাহ বলা।

[৩] আল্লাহু আকবার বলা।

[৪] আলহামদু লিল্লাহ বলা।

[৫] লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল

[৬] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫২

[৭] সূরা ত-হা, আয়াত : ১১৪

উল্লেখ্য যে, জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য শুধু প্রার্থনাই যথেষ্ট নয়; বরং সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টাও করতে হবে। প্রয়োজনে জ্ঞানীদের শরণাপন্ন হতে হবে। কারণ, কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

তোমরা যদি না জানো, তাহলে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করো।[১]

এ ছাড়াও সুযোগ পেলেই জ্ঞানীদের মজলিসে উপস্থিত হওয়া। কারণ, জ্ঞানীদের মজলিসে গমনকারী ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে—

"

هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ

তারা এমন সম্প্রদায়—যাদের সাথী-সঙ্গীরাও কখনো দুর্ভোগ পোহায় না।[২]

অধিকন্তু জ্ঞানার্জন ঈমানের পূর্বশর্ত ও ঈমানবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। কেননা, কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ

হে নবী, আপনি জেনে নিন যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই এবং আপনার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুণ।[৩]

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতে আল্লাহ সৎকাজের পূর্বে 'জ্ঞান' অর্জনের কথা বলেছেন।

পাঁচ. দান-সাদাকা ও যাকাত-ফিতরার মাধ্যমেও ঈমান বৃদ্ধি পায়। 'রামাদান : বদান্যতার উর্বর ক্ষেত্র' শিরোনামে এ ব্যাপারে আমরা সমৃদ্ধ আলোচনা করেছি।

---

[১] সূরা নাহল, আয়াত : ৪৩

[২] *সহীহ বুখারী* : ৬৪০৮

[৩] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ১৯

বিস্তারিত জানার জন্য সেখানে দেখা যেতে পারে।

ছয়. সৃষ্টিজগৎ এবং চারপাশে ছড়ানো আল্লাহর নিদর্শন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

আর তারা আসমান-জমিনের সৃষ্টি (রহস্য) নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। (একসময় তারা বলে ওঠে) হে আমাদের প্রতিপালক, এসব আপনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনি আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুণ।[১]

রামাদান গবেষকদের মস্তিষ্ক পরিষ্কার করে। চিন্তাশীলদের চিন্তা শানিত করে। উপদেশ গ্রহণকারীদের অন্তর আলোকিত করে। এভাবে মন ও মস্তিষ্ক মহান আল্লাহর সৃষ্টি-নৈপুণ্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

উল্লেখ্য যে, ঈমান-বৃদ্ধির যেমন একাধিক কারণ রয়েছে, তেমনই ঈমান হ্রাস পাওয়ার, দুর্বল হওয়ার এমনকি একেবারে নষ্ট হয়ে যাওয়ারও বেশ কিছু কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি কারণ হলো—

এক. আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ থেকে বিমুখ হয়ে মানব-মস্তিষ্ক-প্রসূত নীতি ও বিধান অনুসরণ করা। যখন কোনো বান্দা এমনটি করে তখন সে মূলত ভালোর পরিবর্তে মন্দকে গ্রহণ করে। ফলে সে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হতভাগ্য শয়তানের অনুচর বলে বিবেচিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন—

أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ

ওরাই হলো শয়তানের দল। আর জেনে রাখো, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত।[২]

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯১

[২] সূরা মুজাদালাহ, আয়াত : ১৯

দুই. অসার খেল-তামাশা, হারাম বিনোদন এবং বাতিলপন্থী ও প্রবৃত্তিপূজারীদের সঙ্গ-গ্রহণ ঈমান হ্রাস পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। মহান আল্লাহ বলেন—

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

হে নবী, তুমি তার অনুসরণ কোরো না, যার অন্তরকে আমার স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।[১]

তিন. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাপকাজে ব্যবহার করলেও ঈমান কমে যায়। কারণ, পাপকাজ করার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে কালো একটি দাগ পড়ে। মানুষ যখন বারবার পাপকাজ করতে থাকে তখন তার হৃদয় কলুষে ছেয়ে যায়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গুনাহের বিবরণ নিম্নরূপ—

চোখ হারাম বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করে। কান গান-বাদ্য শ্রবণ করে। অন্তর কাম-বাসনার জগতে বিচরণ করে। হাত অন্যায় কাজে সাহায্য করে। লজ্জাস্থান অশ্লীলতা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। পেট হারাম ভক্ষণ করে।

সুতরাং, প্রত্যেক সিয়াম পালনকারীর অবশ্য-কর্তব্য হলো, রামাদানে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি খতিয়ে দেখা। বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও লঘুতা পরখ করা এবং লাভ-লোকসানের একটি খতিয়ান তৈরি করা।

হে আল্লাহ, তুমি আমাদের ঈমান বাড়িয়ে দাও। ভালো ও কল্যাণকর কাজের তাওফীক দাও।

[১] সূরা কাহাফ, আয়াত : ২৮

রামাদানে আল্লাহর ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়

রামাদান মাসে সিয়াম পালনের মধ্য দিয়ে মুমিনের হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি অসামান্য ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ তাঁকে প্রচণ্ডরকমের ভালোবাসেন। ফলে আল্লাহও তাদের ভালোবাসেন। উল্লেখ্য যে, 'বান্দা-কর্তৃক আল্লাহকে ভালোবাসার মধ্যে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের সৃষ্টি করেছেন। জীবিকা ও নিরাপত্তা দান করেছেন। প্রভূত নিয়ামতে তাদের জীবনকে সহজ ও সুখময় করেছেন। সুতরাং, তারা আল্লাহকে ভালোবাসবে—এটাই স্বাভাবিক; বরং অবাক হওয়ার বিষয় হলো জীবন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরও স্বয়ং আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।

আল্লাহকে ভালোবাসার দশটি লক্ষণ রয়েছে। কারও মধ্যে এই লক্ষণগুলো পাওয়া গেলে সে প্রকৃত অর্থেই মহান আল্লাহকে ভালোবাসে বলে বিবেচিত হয়। লক্ষণগুলো হলো—

এক. আল্লাহর বাণী ও রাসূলের সুন্নাহকে ভালোবাসা। এই অমীয় বাণী তিলাওয়াতের প্রতি আগ্রহ বোধ করা। তার অর্থ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। হাদীসের পাঠ গ্রহণ করা। কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। হৃদয়-মন ও চিন্তা-চেতনাকে পরিশুদ্ধ করা। রাতজেগে কুরআন তিলাওয়াত করা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

দুই. আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসা। তার নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন-যাপন করা। তার প্রতি বেশি বেশি দরূদ ও সালাম পাঠ করা। তাকে নিষ্পাপ জ্ঞান করে জীবনের

আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা। মহান আল্লাহ বলেন—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

বস্তুত আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ—এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।[১]

অতএব, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা প্রমাণ করতে হলে তার রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসতে হবে। তার সুন্নাহ অনুসারে আমল করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন—

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের মাঝে ঘটে যাওয়া সমস্যার ব্যাপারে তোমাকে বিচারক হিসেবে মেনে নেয় অতঃপর তোমার দেওয়া সিদ্ধান্তে তাদের অন্তরে কোনো সঙ্কোচ না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয়।[২]

তিন. আল্লাহর হারামকৃত বস্তু থেকে সাবধান থাকা এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ সীমারেখায় পতিত হওয়া থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ-কর্তৃক প্রদত্ত কোনো বিধানের অবমাননা হলে ক্রুদ্ধ হওয়া। দ্বীনের খাতিরে আগুনে ঝাঁপ দিতে হলেও প্রস্তুত থাকা। বিদআতীদের মাঝে দ্বীন প্রচার করতে গিয়ে তাদের দেওয়া কষ্ট সহ্য করা এবং পৃথিবীর বুকে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য—প্রয়োজন ও সামর্থ্যভেদে অস্ত্র, ভাষা ও হৃদয়ের ঘৃণার মাধ্যমে সংগ্রাম করা।

চার. আল্লাহর ওলী ও প্রিয়ভাজন হওয়ার চেষ্টা করা এবং আল্লাহর ওলীদেরকে সম্মান করা। মহান আল্লাহ তার ওলীদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—

---

[১] সূরা মুমতাহিনা, আয়াত : ০৬

[২] সূরা নিসা, আয়াত : ৬৫

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

জেনে রেখো, আল্লাহর ওলীদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। যারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে। আর এরাই তারা, যারা তার প্রতি ঈমান আনে এবং তাকে ভয় করে।[১]

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۝
وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۝

তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তার রাসূল এবং সেসব ঈমানদার লোকেরা যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে। সর্বোপরি বিনীত থাকে। আর যে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে যেন জেনে রাখে যে, আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে।[২]

পাঁচ. সৎকাজের আদেশ করা, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা এবং এই পথে নিজের জান-মাল কুরবান করা। কারণ, এটাই হলো ইসলামের ঢাল, অক্ষ ও চালিকাশক্তি। এটা আছে বলেই ইসলাম আজও সুরক্ষিত। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন—

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

তোমাদের মাঝে যেন এমন একটি দল থাকে, যারা কল্যাণের পথে আহ্বান করবে। সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। (যারা এটা করে) তারাই হলো সফলকাম।[৩]

এই বৈশিষ্ট্যটি রামাদান মাসে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। যথাযথ সিয়াম পালনকারীগণ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার কাছে সাওয়াব পাওয়ার আশায় তার বান্দাদেরকে বেশি বেশি নসীহত করেন এবং দাওয়াত দেন।

---

[১] সূরা ইউনুস, আয়াত : ৬২-৬৩

[২] সূরা মায়িদা, আয়াত : ৫৫-৫৬

[৩] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০৪

ছয়. সৎলোকদের সাথে ওঠাবসা করা, তাদের ভালোবাসা, তাদের সদুপদেশ শ্রবণ করা, তাদের প্রতি গভীর টান ও মমত্ব বোধ করা। তাদের জন্য বেশি বেশি দুআ করা, তাদের সম্মান রক্ষা করা এবং সাধ্যমতো তাদের ভালো গুণগুলো স্মরণ করা ও সেগুলো নিজেদের মধ্যে ধারণের চেষ্টা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

মুমিনগণ মূলত ভাই ভাই।[১]

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো। পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেয়ো না।[২]

সাত. নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা করা। সালাত, সিয়াম, সাদাকা, হজ, উমরা, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার, সদাচারণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা এবং এজাতীয় অন্যান্য নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

তারা ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করত এবং আমাকে ডাকত—আশায় আশায় ও ভয়ে ভয়ে। আর তারা ছিল আমার প্রতি বিনীত।[৩]

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন—

[১] সূরা হুজুরাত, আয়াত : ১০

[২] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০৩

[৩] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৯০

“

وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ

আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা করতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি।[১]

আট. অস্থায়ী দুনিয়ার ওপর আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া এবং পরকালের সফরের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করা।

নয়. খাঁটি তাওবা করে সমস্ত পাপকাজ ছেড়ে দেওয়া। যে-সকল বিপথগামী ও পাপিষ্ঠ আল্লাহর বিধান নিয়ে খেল-তামাশা করে তাদের এড়িয়ে চলা। গাফিল ও অকর্মণ্যদের সংশ্রব ত্যাগ করা। কারণ, তাদের সংশ্রব সংক্রমক ব্যাধির চেয়েও বেশি মারাত্মক। আল্লাহ তাআলা বলেন—

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

সে-দিন বন্ধুরা একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে। শুধুমাত্র মুত্তাকীগণ ছাড়া।[২]

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

“

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

যে যাকে ভালোবাসে, কিয়ামতের দিন তাকে তার সাথেই পুনরুত্থিত করা হবে।[৩]

দশ. আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা। জান্নাতের বিনিময়ে নিজের জীবন, সম্পদ ও সন্তানসন্ততি আল্লাহর কাছে হস্তান্তরের চুক্তি করা। এই লাভজনক চুক্তি কখনো ভঙ্গ না করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৬৫০২

[২] সূরা যুখরুফ, আয়াত : ৬৭

[৩] *জামি তিরমিযী* : ২৩৮৫

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট হতে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন, এর বিনিময়ে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতঃপর তারা হত্যা করে ও নিহত হয়।[১]

হে আল্লাহ, তুমি তোমার প্রতি আমাদের ভালোবাসা বাড়িয়ে দাও। তোমার কাছে যা আছে তার প্রতি আমাদের আগ্রহ বাড়িয়ে দাও। তোমার অভিমুখী হওয়ার শক্তি দাও। তুমি তো সব কিছুর ওপরই ক্ষমতাবান।

[১] সূরা তাওবা, আয়াত : ১১১

সন্তান প্রতিপালন

সন্তান প্রতিপালনের সত্য, সুন্দর ও সুস্পষ্ট পদ্ধতি প্রতিভাত হয়ে ওঠে রামাদানে। শিশুরা হলো আমাদের কাছে আমানত ও গচ্ছিত সম্পদ। আমাদের মহান পূর্বসূরীগণ সন্তান ও অধীনদের সিয়াম এবং কিয়ামের প্রশিক্ষণ দিতেন। শৈশব থেকেই তাদের এ ব্যাপারে অভ্যস্ত করে তুলতেন।

সুতরাং, যারা বাস্তবিক অর্থেই সন্তানদের সার্বিক সফলতা কামনা করে তাদের জন্য সন্তান প্রতিপালন বিষয়ে কিছু কথা তুলে ধরছি। আশা করছি, এগুলো সন্তানের সুষ্ঠু প্রতিপালনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এক. হে পিতা, আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্র, চাল-চলন ও জীবন-যাত্রায় আপনিই আপনার সন্তানের আদর্শ হোন। কারণ, আপনার শিশু আপনাকে একজন সফল বাবা, আন্তরিক শিক্ষক, বিচক্ষণ অভিভাবক ও জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে দেখতে চাইবে। মহান আল্লাহ যাকারিয়া আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন—

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

Contents

অতঃপর আমি তার স্ত্রীকে সুস্থ করে দিলাম। তারা সব সময় ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করত এবং আমাকে ডাকত আশা ও ভয় নিয়ে। আর তারা ছিল আমার অনুগত।[১]

দুই. শিশু তার অবুঝ শৈশবে যা-কিছু দেখে কিংবা যা-কিছু শোনে, তার ভবিষ্যত জীবনে সেগুলোর গভীর প্রভাব পড়ে। কাজেই সন্তানের কল্যাণ চাইলে বাড়িতে অবশ্যই বেশি বেশি ঈমানের আলোচনা করতে হবে। কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। বেশি বেশি যিকির-আযকার করতে হবে। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হবে। এক কথায়, আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ মেনে চলতে হবে। তবেই আদর্শ, সুন্দর ও অনুগত সন্তান গঠন সম্ভব হবে।

পক্ষান্তরে, বাড়ির লোকেরা যদি গান-বাদ্য শোনায় অভ্যস্ত হয়। উদাসীনতা ও খেল-তামাশায় মত্ত থাকে এবং সব সময় আল্লাহর নাফরমানি করে অথবা আল্লাহর দ্বীনকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে—তবে সন্তান বখে যায় এবং অনাচার ও পাপাচারে জড়িয়ে পড়ে।

তিন. শিশুর সঙ্গে কুরআনের সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। তাকে হিফজ, তাজবীদ ও তিলাওয়াতে অভ্যস্ত করতে হবে। কারণ, শৈশবই কুরআন হিফয করার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। অভিভাবকদের উদাসীনতায় এই মহামূল্যবান সময়টা নষ্ট হয়ে গেলে অভিভাবকের তো বটেই, সন্তানেরও আফসোসের সীমা থাকবে না; কিন্তু তখন আফসোস ও অনুতাপ কোনো কাজে আসবে না।

চার. শৈশবে ও বাল্যকালে শিশুকে পর্যাপ্ত সময় ও সঙ্গ দিতে হবে। অভদ্র ও চরিত্রহীনদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখতে হবে। কারণ, দুষ্টু সঙ্গ শিশুর জন্য সংক্রমক ব্যাধির চেয়েও অধিক ক্ষতিকর। তাছাড়া প্রবাদ আছে—'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎসঙ্গে সর্বনাশ।' অর্থাৎ, সঙ্গী ভালো ও সৎ হলে সন্তানের মধ্যে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। ভবিষ্যত জীবনে সে-ও সৎ ও সজ্জন হওয়ার চেষ্টা করে। অপর দিকে সঙ্গী অসৎ হলে সন্তানের ওপর তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সন্তানের ভবিষ্যত জীবনে কষ্ট ও দুর্ভোগ নেমে আসে। আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে বিশুদ্ধসূত্রে প্রমাণিত, তিনি বলেন—

[১] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৯০

❝

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

মানুষ মূলত তার বন্ধুর আদর্শ অনুসরণ করে। সুতরাং, তোমাদের প্রত্যেকে যেন খেয়াল করে, সে কাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে যাচ্ছে।[১]

পাঁচ. সন্তানকে এই শিক্ষা দিতে হবে যে, মানুষ বংশীয় পরিচয়ে বড় হয় না; বরং আপন প্রতিভা ও প্রচেষ্টায় তাকে বড় হতে হয়। সদগুণ অর্জন করে ভালো কাজ করতে হয়। মন্দস্বভাব বর্জন করে পাপকাজ থেকে বেঁচে থাকতে হয়। সুতরাং, শৈশব থেকে শিশুর মধ্যে ভালো কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে এবং মন্দ কাজের প্রতি ঘৃণা জাগাতে হবে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত, তিনি বলেন—

❝

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا

আল্লাহ তাআলা উন্নত স্বভাব ভালোবাসেন। আর ইতর স্বভাব ঘৃণা করেন।[২]

সুতরাং, শিশুকে তরলতার সুযোগ দেওয়া যাবে না। নারী, কণ্ঠশিল্পী অথবা অভিনয়-শিল্পীদের অনুসরণ করতে দেওয়া যাবে না। অন্যথায় পরবর্তী সময়ে এটা সন্তান ও অভিভাবকদের জন্য লজ্জা, অপমান ও অনুশোচনার কারণ হবে।

ছয়. সন্তানের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং চাল-চলনের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। তাকে এ বিষয়ক সুন্নাহ শিক্ষা দিতে হবে। ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত করতে হবে এবং কাফিরদের বেশ-ভূষা ও চাল-চলনের সঙ্গে যেন মিলে না যায় সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ, আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত আছে, তিনি বলেন—

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৮৩৩; *জামি তিরমিযী* : ২২৭৮

[২] *সহীহ জামিউস সগীর* : ১৮৮৯

"

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

যে-ব্যক্তি যে-জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখবে, সে তাদেরই দলভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।[১]

তাই ছেলে শিশুদের স্বর্ণালঙ্কার ও রেশমি কাপড় পরানো থেকে বিরত থাকতে হবে। কাপড় যেন টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে না পরে সে দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। কথায় ও চালচলনে মেয়েলি ভাব পরিহার করতে উৎসাহিত করতে হবে। হাসি-তামাশা ও অনর্থক কাজকর্ম থেকে বারণ করতে হবে। সময়ের গুরুত্বের ব্যাপারে সতর্ক করতে হবে এবং বোঝাতে হবে যে, এগুলো মন্দ স্বভাব। ভালো মানুষ হতে হলে অবশ্যই এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

সাত. শিশুর হৃদয়ে আল্লাহর বিধানের মাহাত্ম্য এবং দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয়ের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে হবে। তাকে আল্লাহর নাম, গুণাবলি ও কার্যাবলির ব্যাপারে ধারণা দিতে হবে। আল্লাহ যে সকল দোষ-ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে সে-সম্পর্কেও বিশ্বাসী করে তুলতে হবে। আর এজন্য শৈশবেই শিশুর সামনে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে। এতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মহত্ত্ব, তার বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার রাসূলের মর্যাদা তার হৃদয়ে গেঁথে যাবে।

আট. শিশুকে ধর্মীয় জ্ঞান-অর্জনে আগ্রহী করে তুলতে হবে। অধ্যবসায়, বিশুদ্ধ নিয়ত, পাঠচর্চা ও মুখস্থকরণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞান অর্জনের সুফল ও প্রতিদান সম্পর্কেও ধারণা দিতে হবে। এতে সে নতুন উদ্যম ও আগ্রহ ফিরে পাবে।

নয়. প্রত্যেক সালাতে, দুআ কবুলের বিশেষ মুহূর্তগুলোতে এবং শেষ রাতে মহান আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করা—যেন আল্লাহ সন্তানকে সংশোধন করেন, হেদায়াতের পথে পরিচালিত করেন এবং সকল প্রকার মন্দ কাজ ও অপরাধ প্রবণতা থেকে রক্ষা করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৫১২

নেক বান্দারা বলে, হে আমাদের রব, আপনি আমাদের আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের মধ্য থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদের মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দেন।[১]

দশ. শিশুদের সাথে বিনম্র আচরণ করা। তাদের স্নেহ করা এবং ভালোবাসা। মাঝেমধ্যে চুম্বন করা। তাদের সাথে হাসি-আনন্দ ও সৃজনশীল বিনোদন করা। তাদের প্রতি নির্দয় ও কঠোর আচরণ না করা। মানুষের সামনে তাদের অপমান না করা এবং কোনো অবস্থায়ই তাদের মনে আঘাত না দেওয়া। তাদের সাথে ঠিক ওইভাবে কথা বলা, যেভাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন।

হে আল্লাহ, আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের কল্যাণ ও বরকতের মাঝে রাখুন। হে আমাদের রব, আপনি আমাদের চক্ষু শীতলকারী সঙ্গী ও সন্তানসন্ততি দান করুন এবং আমাদের মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দিন।
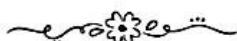
[১] সূরা ফুরকান, আয়াত : ৭৪

রামাদানে অপচয়ের কিছু নির্মম চিত্র

আমরা যে-সকল পাপাচারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হলো অপচয়। অথচ আল্লাহ তাআলা আমাদের এই অপচয় থেকে নিষেধ করেছেন এবং অপচয়ের নিন্দা করে বলেছেন—

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

তোমরা অপচয় করো না। কারণ, আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না।

অপচয় হলো সেই সব লোকদের অভ্যাস, যারা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করতে চায় না। আল্লাহর নিয়ামতকে সম্মান দেখায় না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝

তোমরা অপচয় করো না। কারণ, অপচয়কারীগণ শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের বড়ই অকৃতজ্ঞ।[১]

[১] সূরা ইসরা, আয়াত : ২৬-২৭

সমাজে এমন অনেক লোক আছে, যারা রামাদান মাসে প্রচুর অপচয় করে। নিম্নে অপচয়ের কিছু চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে—

এক. প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ করা। অনেককেই দেখা যায়, রামাদানে সাহরী ও ইফতারে বাহারি খাবারে টেবিল ভরে ফেলে। এরপর যৎসামান্য খেয়ে বাকিটা ডাস্টবিনে ফেলে দেয়।

হে সিয়াম পালনকারী, অপচয় থেকে সাবধান! মুসলিমদের মাঝে অনেক অভাবী, হত-দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তি আছে। তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবারটুকু নষ্ট না করে তা দিয়ে আল্লাহর বান্দাদের ইফতারের ব্যবস্থা করো। এতে আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। তোমার খাবারগুলোও নষ্ট না হয়ে মহান আল্লাহর কাছে গচ্ছিত সম্পদ হয়ে থাকবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার সৎকর্মশীল বান্দাদের সম্পর্কে বলেন—

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا

তারা খাবারের প্রতি নিজেদের আসক্তি সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদের খাবার দান করে। (তারা বলে) আমরা তো তোমাদের খাবার দিচ্ছি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তোমাদের থেকে কোনো প্রতিদানের আশা করি না, কৃতজ্ঞতারও না। আমরা আমাদের রবের পক্ষ থেকে এক ভয়ঙ্কর দিনের আশঙ্কা করি।[১]

রাসূল ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত, তিনি বলেন—

“

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي ، قَالَ : يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ، قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ ، فَلَمْ تُطْعِمْهُ ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي

---

[১] সূরা দাহর, আয়াত : ৮ - ১০

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আদম-সন্তান, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তুমি আমাকে খাবার দাওনি। বান্দা তখন বলবে, হে আল্লাহ, কীভাবে তোমাকে খাবার দেবো, তুমিই তো সারা বিশ্বের রব? আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা ক্ষুধার্ত ছিল? কিন্তু তুমি তাকে খাবার দাওনি। শোনো! যদি তুমি তাকে খাবার দিতে, তাহলে তা তুমি আমার কাছে পেতে। ....

দুই. প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ঘুমানো—বিশেষ করে দিনের বেলায়। অনেক সিয়াম পালনকারী রামাদানের দিনকে রাত বানিয়ে ফেলে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই লোকগুলোই আবার অর্থহীনভাবে রাতে জেগে থাকে। অনর্থক কথা-বার্তা ও খেল-তামাশায় উদ্দেশ্যহীনভাবে সময় নষ্ট করে। অনেকে আবার হারাম কিংবা মাকরূহ কাজেও লিপ্ত থাকে। অথচ তারা জানে, তাদের এধরনের কাজে মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

তিন. ঈদুল ফিতরের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অপচয় করা। নিজের ওপর সাধ্যাতীত ব্যয়ের বোঝা চাপিয়ে নেওয়া। আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জা ও খেলনা-সামগ্রী ক্রয় করতে গিয়ে অর্থ অপচয় করা। অনেকে তো এসব তুচ্ছ বস্তু কিনতে গিয়ে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে ফেলে। অথচ দান-সাদাকা ও জনহিতকর কাজে এরাই আবার সবচেয়ে বেশি কৃপণতার পরিচয় দেয়।

সুতরাং, হে সিয়াম পালনকারী, আল্লাহ আপনাকে সম্পদের নিয়ামত দান করেছেন। এই নিয়ামতের মূল্যায়ন করুন। অপচয় না করে সমাজের ইয়াতীম-অসহায় এবং দুস্থ ও অভাবীদের দান করুন। তাদের অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করুন। ছিন্নমূল শিশুদের পুনর্বাসন করুন। মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করুন এবং বিপদগ্রস্ত লোকের পাশে দাঁড়ান।

চার. অনেক সিয়াম পালনকারী অপ্রয়োজনে একে অপরের সাক্ষাতে গিয়ে লম্বা সময় ব্যয় করে। অনর্থক ক্রীড়া-কৌতুক ও বাক্যালাপে সময় নষ্ট করে। কিয়ামতের দিন এরাই অনুতপ্ত হয়ে বলবে—

يَاحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا

এ ব্যাপারে যে-সীমালঙ্ঘন করেছি, তার জন্য আফসোস![১]

[১] সূরা আনআম, আয়াত : ৩১

পাঁচ. আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদন-সামগ্রীতে আসক্ত হওয়া। ফুটবল, ক্রিকেট, প্রমোদবিহার বা এ ধরনের কোনো কাজে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া। পক্ষান্তরে ইবাদাত, তিলাওয়াত, যিকির-আযকার ও অন্যান্য নেক আমলে সময় না দেওয়া।

অনেকে তো সময়ের শুধু অপব্যবহারই করে না; বরং সময় ওড়ায়। এরা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সময়ের মূল্য বুঝতে পারবে।

এছাড়াও বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে অপচয় করে থাকে। যেমন—

- অনেকে পাপাচারের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে। এটাও এক ধরনের অপচয়; বরং এটাই সবচেয়ে জঘন্য ও মারাত্মক অপচয়।
- অনেকে আবার সময়ের অপচয় করে। কিয়ামতের দিন এই শ্রেণি অপব্যায়কারীরাই সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে।
- অনেকে খাবার-পানীয় ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে অপচয় করে। পরিণতিতে এই অপচয় কেবল তাদের দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতাই বৃদ্ধি করে।
- অনেকে আবার বৈধ বিনোদন ও ঘোরাঘুরিতে সময় নষ্ট করে। প্রকৃতপক্ষে এরা নিজেদের বয়স ও জীবনের সময়-সীমার ব্যাপারে উদাসীন থাকে।

আমরা আল্লাহর কাছে ভালো কাজ, সঠিক সিদ্ধান্ত, হেদায়াতের পথ এবং মিতব্যয়িতা অবলম্বনের তাওফীক কামনা করি।

রামাদান : সদাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার পয়গাম

রামাদানে সিয়াম পালনকারীর মন নরম হয়। হৃদয়ে দয়া ও ভালোবাসার উদ্রেক হয়। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তার এই দয়া ও ভালোবাসার পাওয়ার সবচেয়ে বড় হকদার হলো তার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন। রামাদান একজন মুসলিমকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সে একা নয়; তার অনেক আত্মীয়-স্বজন আছে। কাজেই তার উচিত হলো, তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা, সদ্ভাব ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের প্রতি সদাচারণ করা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ

তবে কি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে? তাদেরই তো আল্লাহ লানত করেন এবং করেন বধির ও দৃষ্টিহীন।[১]

উপর্যুক্ত আয়াত থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ, মহা অপরাধ এবং পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন ভঙ্গা হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। অপরদিকে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা সবচেয়ে বড় পুণ্যকর্ম ও মহৎকাজ।

[১] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ২২-২৩

আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে সহীহসূত্রে প্রমাণিত, তিনি বলেন—

“

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[১]

“

إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ ، قَالَتِ الرَّحِمُ : هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ ، قَالَ : نَعَمْ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ : بَلَى يَا رَبِّ ، قَالَ : فَهُوَ لَكِ

আত্মীয়তার সম্পর্ককে সৃষ্টি করার পর সে দাঁড়িয়ে আল্লাহর আরশ ধরে বলে, ‘আমাকে ছিন্ন করা’ হতে আশ্রয় চাওয়ার জন্যই আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়েছি। আল্লাহ তখন বলেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, যে-ব্যক্তি তোমার সম্পর্ক বজায় রাখবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব। আর যে-ব্যক্তি তোমাকে ছিন্ন করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব? আত্মীয়তার সম্পর্ক তখন বলে, হ্যাঁ আমি সন্তুষ্ট। আল্লাহ বলেন, এই প্রতিশ্রুতি তোমাকে দেওয়া হলো।[২]

রাসূল ﷺ আরও বলেন—

“

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِى إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

প্রকৃত সম্পর্ক রক্ষাকারী সে নয়, যে অন্যের সম্পর্ক রক্ষার বিনিময়ে সম্পর্ক রক্ষা করে; বরং প্রকৃত সম্পর্ক রক্ষাকারী সে, যে-কোনো কারণে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলেও বজায় রাখার চেষ্টা করে।[৩]

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৫৯৮৪; *সহীহ মুসলিম* : ২৫৫৬

[২] *সহীহ বুখারী* : ৫৬৬৪; *সহীহ মুসলিম* : ৪৭৬২

[৩] *সহীহ বুখারী* : ৬৯

"

أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي ، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ

জনৈক সাহাবী বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার কিছু আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখি; কিন্তু তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের প্রতি সদাচার করি; কিন্তু তারা আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করে। তার কথা শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, যা বললে, যদি সত্যি সত্যি তাই হয়ে থাকে, তবে তুমি যেন তাদের মুখে উত্তপ্ত বালু ঢালছ। আর জেনে রেখো, তোমার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক একজন সাহায্যকারী নিয়ুক্ত থাকবে।[১]

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর অধিকাংশ আত্মীয়ই ছিল তার জানের দুশমন। তারা তাকে বর্ণনাতীত কষ্ট দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। জন্মভূমি ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছে। এতকিছুর পরও আল্লাহ যখন তাকে দুশমনদের ওপর বিজয় দান করেন তখন তিনি সব কিছু ভুলে তাদের ক্ষমা করে দেন—ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

আত্মীয়তার সম্পর্কের সঙ্গে মানুষের আয়ুষ্কালের গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কেউ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে তার আয়ু বৃদ্ধি পায়। জীবনে শান্তি, স্থিতি ও নিরাপত্তা আসে। ফলে সাওয়াবের কাজ করার বাড়তি সুযোগ পাওয়া যায় এবং উত্তরোত্তর তার সাওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এছাড়াও আত্মীয়তার সম্পর্ক ঈমানের পূর্ণতা ও আল্লাহর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের প্রমাণ বহন করে। অপমৃত্যু বা অকস্মাৎ মৃত্যু রোধ করে। সর্বোপরি দুনিয়া ও আখিরাতের লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা থেকে রক্ষা করে।

একটি আসারে[২] বর্ণিত আছে—

أَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي وَأَنْ أُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي وَأَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي

আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন, যে আমার সাথে সম্পর্ক ছেদ করে আমি যেন তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করি। যে আমাকে বঞ্চিত করে আমি যেন তাকে দান করি। যে আমার প্রতি যুলুম করে আমি যেন তাকে ক্ষমা করি।[৩]

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ২৫৫৮

[২] সাহাবীদের উক্তিকে আসার বলা হয়।

[৩] *মিরকাত শরহু মিশকাত* : ৫৩৫৮

পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হলো মা-বাবার সাথে সন্তানের সম্পর্ক। কাজেই সন্তানকে যে-কোনো মূল্যে এই সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। মা-বাবার সাথে সদাচারণ করতে হবে। তাদের প্রতি কোমল ও বিনম্র হতে হবে। তাদের সম্মান দিতে হবে এবং তাদের জন্য দয়া ও করুণার দুআ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে বাদ দিয়ে অন্য কারও ইবাদাত করবে না এবং মা-বাবার প্রতি সদ্ব্যবহার করবেন। তারা উভয়ে অথবা তাদের কোনো একজন তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদের 'উফ' শব্দটিও বলো না এবং তাদের ধমক দিয়ো না। তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত হয়ে বলো—হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করো, যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিল।[১]

হাদীস শরীফে এসেছে—আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত,

"

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : أُمُّكَ قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَبُوكَ

জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমার সদাচারণ পাওয়ার সর্বাধিক হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, তার পরে কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জানতে চাইল, তার পরে কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করল, তার পরে কে? তখন তিনি বললেন, তোমার বাবা।[২]

---

[১] সূরা ইসরা, আয়াত : ২৩-২৪

[২] *সহীহ বুখারী* : ৫৯৭১; *সহীহ মুসলিম* : ২৫৪৮

আমার মনে হয়, সৎকর্ম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক শেখার ক্ষেত্রে সিয়াম হলো সবচেয়ে উপযুক্ত সময় ও বড় মাধ্যম। কারণ, রামাদান উত্তম চরিত্রের উন্মেষ ঘটায়। দয়া-অনুগ্রহ এবং প্রেম-ভালোবাসা সৃষ্টি করে। হৃদয় বিগলিত করে। অনুভূতি তীব্র করে এবং মেজাজ শান্ত করে। কাজেই রামাদানে আমরা চাইলেই আত্মীয়-স্বজনদের খবর নিতে পারি। তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি। তাদের জন্য দুআ করতে পারি এবং বিভিন্ন সময়ে উপহার-সামগ্রী নিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হতে পারি; বরং এটা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

হে আল্লাহ, আমাদের দ্বীনের জ্ঞান দাও। নবী ﷺ-এর সুন্নাহর ওপর অটল রাখো এবং সঠিক পথে পরিচালনা করো।
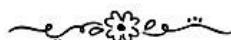
রামাদান : মুসলিমদের জন্য রহমত

'রহমত' তথা 'দয়া' হলো আল্লাহর অনুগ্রহ-বিশেষ। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তার হৃদয়েই কেবল দয়ার উদ্রেক করেন; অধিকন্তু তিনি কেবল তার দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়া করেন।

আল্লাহ তাআলা রহমান, রহীম—চিরদয়ালু; পরম করুণাময়। তাই তিনি দয়ালুদের ভালোবাসেন এবং সবাইকে পারস্পরিক দয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন।

সৃষ্টিগতভাবে প্রতিটি মানুষ দয়াগুণ-প্রাপ্ত হয়; কিন্তু পরবর্তী সময়ে নানা কারণে তার এই গুণটি লোপ পায়। যেমন—

এক. আল্লাহর নাফরমানি ও অবাধ্যতা।

বস্তুত আল্লাহর নাফরমানি ও অবাধ্যতা মানুষের হৃদয়কে কলুষিত করে। চেতনাকে নিষ্প্রভ করে। ফলে অব্যাহত অবাধ্যতার কারণে একটা পর্যায়ে এসে সে অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়ে। তখন তার হৃদয় পাথরের চেয়েও শক্ত হয়ে যায়। সহজাত দয়া-গুণটি হারিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন—

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

এসব কিছুর পর তোমাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেল। এমনকি তা হয়ে গেল পাথরের মতো; বরং তার চেয়েও বেশি শক্ত।[১]

আল্লাহর বিধানের প্রতি তাদের ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের শাস্তির কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

অতঃপর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণেই তো আমি তাদের অভিসম্পাত করেছি এবং তাদের অন্তর কঠিন করে দিয়েছি।[২]

দুই. সম্পদের বড়াই ও স্বেচ্ছাচারিতা।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ ۝ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ ۝

বস্তুত মানুষ প্রকাশ্য স্বেচ্ছাচার করছে। কেননা, সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে।[৩]

তিন. অত্যধিক পানাহার

মানুষের দয়া হ্রাস পাওয়ার কিংবা বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাব্য একটি কারণ হলো অত্যধিক পানাহার। কেননা, পানাহারের আধিক্য অন্তরে দম্ভ ও অহংকার সৃষ্টি করে। তখন নিজেকে বড় ও স্বয়ংসম্পন্ন মনে হতে থাকে। অপর দিকে অন্যাকে ছোট ও তুচ্ছ মনে হতে থাকে।

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ৭৪

[২] সূরা মায়িদা, আয়াত : ১৩

[৩] সূরা আলাক, আয়াত : ৬-৭

আর অন্তরের এ সকল ব্যাধি নিরাময়ে সিয়ামের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাই তো আমরা দেখতে পাই, সিয়াম পালনকারী সাধারণ মানুষের প্রতি অধিক দয়াশীল হয়। কারণ, তিনি নিজে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়েছেন। সারা দিন ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করেছেন। ফলে অবচেতন মনেই অন্য মুসলমানের প্রতি তার দয়া ও করুণা সৃষ্টি হয়। মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায়। তখন দয়া প্রদর্শনের এক অনির্বচনীয় অনুভূতি তিনি লাভ করেন।

বস্তুত সকল মুসলমানেরই উচিত সর্বদা অপর মুসলিম ভাইয়ের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা। দায়িত্বশীল তার অধীনদের প্রতি দয়া দেখাবে। তাদের সাথে কোমল আচরণ করবে। তাদের প্রতি সহমর্মী হবে। রাসূল ﷺ বলেন—

"

اللَّهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ ، فَارْفُقْ بِهِ

ইয়া আল্লাহ, আমার উম্মতের মধ্যে যে-ব্যক্তি কোনো দায়িত্ব পেয়ে অধীনদের প্রতি কঠোরতা করে আপনি তার প্রতি কঠোরতা করুন। আর যে সহজতা করে আপনি তার জন্য সহজ করুন।[১]

অপর হাদীসে তিনি বলেন—

"

مَنْ وَلَّاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ، احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে-ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ কোনো কাজের দায়িত্বে নিয়োগ করেছেন, সে যদি লোকদের প্রয়োজন, অসহায়ত্ব ও দারিদ্র্য দূর করার চেষ্টা না করে তাহলে আল্লাহ তাআলাও কিয়ামতের দিন তার প্রয়োজন, অসহায়ত্ব এবং দারিদ্র্য দূর করবেন না।[২]

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ১৮২৮

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ২৯৪৮

আলেম এবং শিক্ষকেরও দয়া ও অনুগ্রহের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তারা ছাত্রদের প্রতি দয়া দেখাবে। তাদের সাথে কোমল ভাষায় কথা বলবে। সুন্দর আচরণ করবে। এতে তারা শিক্ষার্থীদের সশ্রদ্ধ ভালোবাসা পাবেন এবং শিক্ষার্থীরাও খুব সহজেই তাদের ইলম দ্বারা উপকৃত হবে; অধিকন্তু আল্লাহ তাআলাও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। তাদের উত্তম প্রতিদান দান করবেন। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর প্রশংসা করে বলেন—

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

(হে নবী,) এসব ঘটনার পর এটা আল্লাহর রহমতই ছিল। যদ্দরুন তুমি মানুষের সাথে কোমল আচরণ করেছ। তুমি যদি রূঢ় প্রকৃতির কঠোর-হৃদয় হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে গিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত।[১]

ইমাম তার মুসল্লীদের প্রতি দয়া দেখাবে। তাদের সাথে প্রজ্ঞা ও হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করবে। তাদের আগ্রহ ও সামর্থ্য অনুসারে কিয়াম ও তিলাওয়াত দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত করবে। যে-সকল সামাজিক কাজে তার অংশগ্রহণ সাধারণ মানুষের জন্য আনন্দদায়ক ও কল্যাণকর সেসব কাজে নেতৃত্ব দেবে। আনুষঙ্গিক কাজে-কর্মে যেন মুসল্লী ও সাধারণ মানুষের কষ্ট না হয় সে-দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবে। কখনোই তাদের প্রতি কঠোরতা করবে না এবং তাদের কষ্টের কারণ হবে না। রাসূল ﷺ বলেন—

“

أَيُّكُم أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِز فَإِنَّ من وَرائه الكَبِير والضَّعِيف وذا الحَاجَة

তোমাদের মধ্যে যে-ব্যক্তি ইমাম হবে সে যেন সালাত অতি দীর্ঘ না করে। কারণ, মুসল্লীদের মধ্যে বৃদ্ধ, অসুস্থ, শিশু, প্রয়োজনগ্রস্ত—সব ধরনের মানুষই থাকে।[২]

একবার মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু সালাত দীর্ঘ করার কারণে রাসূল ﷺ তাকে তিরস্কার করে বলেন—

---

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৫৯

[২] *সহীহ মুসলিম* : ৪৬৬

"

أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟

হে মুয়াজ, তুমি কি ফিতনা সৃষ্টি করছ? তুমি কি ফিতনা সৃষ্টি করছ? তুমি কি ফিতনা সৃষ্টি করছ?[১]

উসমান ইবনু আবিল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল ﷺ-কে বলেন—

"

يَا رَسُولَ اللهِ ، اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي

ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাকে আমার সম্প্রদায়ের ইমাম বানিয়ে দিন।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম বলেন—

"

أَنْتَ إِمَامُهُمْ ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

ঠিক আছে। তোমাকে তোমার সম্প্রদায়ের ইমাম বানিয়ে দিলাম। তবে সালাত পড়ানোর সময় সম্প্রদায়ের সবচেয়ে দুর্বল লোকটির দিকে খেয়াল রাখবে। আর এমন একজন মুআযযিন রাখবে—যে তার আযানের বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক নেবে না।[২]

অনুরূপ দা'ঈ যাদেরকে দাওয়াত দেয় তাদের প্রতি সদয় আচরণ করবে। তাদের সাথে কোমল ভাষায় কথা বলবে। বিনম্র ভাষায় দাওয়াত দেবে। কোনো কথা দ্বারা তাকে লজ্জিত করবে না। আঘাত করে কথা বলবে না। মানুষের সামনে কারও দোষ বর্ণনা করবে না। আল্লাহ তাআলা মূসা ও হারুন আলাইহিমাস সালাম-কে যখন ফেরআউনকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন তখন তাদের এই আদেশ দেন যে—

---

[১] *মুসনাদ সাররাজ* : ১৯৫, *মুসনাদ শাশী* : ১৩৩৪

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৫৩১

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

তোমরা তার সাথে বিনম্র ভাষায় কথা বলবে। হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা (আল্লাহকে) ভয় করবে।[১]

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

তুমি আপন প্রতিপালকের পথে মানুষকে ডাকবে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে। আর (যদি কখনো বিতর্কের প্রয়োজন পড়ে তাহলে) তাদের সাথে বিতর্ক করবে উৎকৃষ্ট পন্থায়।[২]

মা-বাবা সন্তানের প্রতি দয়া দেখাবে। ইতোপূর্বে এ বিষয়ে 'সন্তান প্রতিপালন' শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মনে রাখতে হবে যে, সন্তানের প্রতি মা-বাবার স্নেহ ও ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা ও কোমলতা সন্তানের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। তাদের উন্নতি ও অগ্রগতির পথকে সুগম করে। কল্যাণের পথে হাত ধরে এগিয়ে নেয়।

বস্তুত সর্বক্ষেত্রেই কঠোরতা ও বাড়াবাড়ি পরিহারযোগ্য। রাসূল ﷺ বলেছেন—

“

مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا عُزِلَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

নম্রতা যে-কোনো বিষয়কে সুশোভিত করে তোলে। আর কঠোরতা যে-কোনো বিষয়কে অসুন্দর করে তোলে।

হে ক্ষুধার্ত সিয়াম পালনকারী, তোমার মতো হাজার হাজার আদম-সন্তান বাস্তবিক অর্থেই অনাহারে বা অর্ধাহারে রয়েছে। এক লুকমা খাবারের জন্য ফুটপাতে বসে

---

[১] সূরা ত-হা, আয়াত : ৪৪

[২] সূরা নাহল, আয়াত : ১২৫

কাতরাচ্ছে। কে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করবে?

হে পিপাসার্ত সিয়াম পালনকারী, তোমার মতো হাজার হাজার আদম-সন্তান পিপাসার্ত রয়েছে। এক ঢোক পানির জন্য হোটেলের সরু গলিটার সামনে বসে ছটফট করছে। কে তাদের পিপাসা নিবারণ করবে?

হে সুন্দর পোশাক পরিহিত সিয়াম পালনকারী, তোমার মতো হাজার হাজার বনী আদম 'লজ্জা' ঢাকার জন্য এক টুকরো কাপড় হন্যে হয়ে খুঁজছে। কে তাদের লজ্জা ঢাকার পোশাক দেবে?

হে রহমতের নবীর উম্মত, এখনো কি সময় আসেনি একটু দয়াপরবশ হওয়ার? এখনো কি সময় হয়নি অপরের ব্যথায় ব্যথিত হওয়ার?

ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাদের রহমতের চাদরে জড়িয়ে নিন। আমাদের গুনাহ ও পদস্খলন ক্ষমা করুন এবং আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন।

Contents
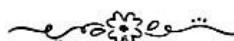
রামাদান : সুন্নাহ বাস্তবায়নের সুবর্ণ সুযোগ

উম্মাহর সর্বোচ্চ ইমাম এবং আমাদের একমাত্র আদর্শ হলেন মুহাম্মাদ ﷺ। তার অনুসরণ-অনুকরণের মধ্যেই পরিপূর্ণ কল্যাণ ও সফলতা নিহিত। এ ছাড়া অন্য কোনো পথে বা মতে সফলতা নেই। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন—

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

যারা বার্তাবাহক উম্মী নবীর অনুসরণ করে—যার কথা তারা তাদের কাছে সংরক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিপিবদ্ধ পায়—তিনি তাদের সৎ কাজের আদেশ করেন ও মন্দ কাজে নিষেধ করেন এবং তাদের জন্য উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করেন ও নিকৃষ্ট বস্তু হারাম করেন।[১]

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর আগমনের পর তার সুন্নাহ অনুসরণ ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তার সুন্নাহগুলো হলো নূহ আলাইহিস সালাম-এর কিশতির ন্যায়। যে এই কিশতিতে আরোহণ করবে সে মুক্তি পাবে। আর যে তা থেকে দূরে থাকবে সে ধ্বংসে নিপতিত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

[১] সূরা আরাফ, আয়াত : ১৫৭

বস্তুত আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ—এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।[১]

রাসূল ﷺ বলেছেন—

❝

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

তোমরা আমার সুন্নাহ এবং আমার পরে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে। দ্বীনের ক্ষেত্রে নব-আবিষ্কৃত বিষয় থেকে দূরে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক নব-আবিষ্কৃত বিষয়ই বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী।[২]

অপর এক হাদীসে তিনি বলেছেন—

❝

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

যে আমার সুন্নাহ থেকে বিমুখ হবে সে (আমার) উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৩]

তিনি আরও বলেন—

❝

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

কেউ আমার সুন্নাহ বহির্ভূত কোনো আমল করলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।[৪]

---

[১] সূরা আহযাব, আয়াত : ২১

[২] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৪২

[৩] *সিলসিলাহ সহীহাহ* : ৩৯৪

[৪] সহীহুল জামিউস সগীর : ৫৯৭০

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

আল্লাহ ও তার রাসূল যখন কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা দেন, তখন কোনো মুমিন নর-নারীর নিজেদের বিষয়ে কোনো ইচ্ছাধিকার বাকি থাকে না।[১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে রাসূলের সামনে অগ্রসর হতে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

হে মুমিনগণ, (কোনো বিষয়ে) তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আগে বেড়ে যেয়ো না। আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু শোনেন, সব কিছু জানেন।[২]

রামাদান মাস হলো বরকতময় মাস। ঘরে-বাইরে এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে রাসূলের পবিত্র সুন্নাহগুলো বাস্তবায়নের সুবর্ণ সুযোগ। ইতোঃপূর্বে রামাদানের বিশেষ সুন্নাহগুলো 'নবীজির সিয়াম পালন' শিরোনামে অতিবাহিত হয়েছে।

এছাড়া সর্বাবস্থায় যে-সুন্নাহগুলো বিশেষভাবে পালনীয় সেগুলোও রামাদানে পরিপূর্ণভাবে আদায় করা সিয়াম পালনকারী প্রতিটি মুসলমানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন—

"

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَاسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ. يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ. قَالَ زَكَرِيَّا : قَالَ مُصْعَبٌ : وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ

[১] সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৬

[২] সূরা হুজুরাত, আয়াত : ০১

দশটি জিনিস ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত—মোচ কাটা, দাড়ি লম্বা রাখা, মেসওয়াক করা, নাকে পানি দেওয়া, নখ কাটা, আঙুলের গিরা ধোয়া, বগলের লোম পরিষ্কার করা, গুপ্তাঙ্গের পশম পরিষ্কার করা, পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা।' রাবী বলেন, আমি দশমটি ভুলে গিয়েছি। তবে কুলি করা হতে পারে।[১]

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ হলো, টাখনুর নিচে লুঙ্গি বা অন্য কোনো পোশাক পরিধান না করা; অধিকন্তু হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ও কঠিন হুঁশিয়ারি বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

“

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ

আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন না যে দম্ভভরে কাপড় মাটিতে হিঁচড়ে হাঁটে।[২]

অপর এক হাদীসে তিনি বলেন—

“

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ

টাখনুর নিচের যে-অংশে কাপড় থাকবে সে-অংশ জাহান্নামে যাবে।[৩]

এ ধরনের আরও কিছু বিষয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। যেমন—

- তিনি দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।[৪]
- কোনো ব্যক্তিকে উঠিয়ে তার আসনে বসতে নিষেধ করেছেন।[৫]
- ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করতে, একপায়ে জুতা পরে হাঁটতে এবং এমন

---

[১] *জামি তিরমিযী* : ২৭৫৭

[২] *সহীহুল জামিউস সগীর* : ২৮০৩

[৩] *সহীহ বুখারী* : ৫৪৭৪

[৪] *সহীহ মুসলিম* : ২০২৫

[৫] *সহীহ বুখারী* : ৫৯১৫

কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন, যে-কাপড় পরলে লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে পড়ে কিংবা তার আকৃতি ও অবয়ব ফুটে ওঠে।[১]

- পান করার সময় পানপাত্রে ফুঁ দিয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।[২]
- স্বর্ণ কিংবা রূপার পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন।[৩]
- (পুরুষদের) স্বর্ণের আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।[৪]
- পুরুষদের স্বর্ণ এবং রেশমী কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।[৫]
- ফজরের পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সালাত পড়তে নিষেধ করেছেন।[৬]
- কবরের দিকে ফিরে সালাত পড়তে নিষেধ করেছেন।[৭]
- ইশার সালাতের পূর্বে ঘুমাতে নিষেধ করেছেন এবং ইশার সালাতের পর কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন।[৮]
- বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন।[৯]
- সাদা চুল উপড়াতে নিষেধ করেছেন।[১০]
- শুধু জুমাবার সিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন।[১১]

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ২০৯৯

[২] *সহীহ বুখারী* : ১৪৯; *সহীহ মুসলিম* : ৩৭৮০

[৩] *সহীহ বুখারী* : ৫৬৩৩; *সহীহ মুসলিম* : ২০৬৭

[৪] *সহীহ মুসলিম* : ২০৯০

[৫] *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৫৩৫, *সুনানুন নাসায়ী* : ৫০৫৪

[৬] *সহীহ বুখারী* : ৫৪৭; *সহীহ মুসলিম* : ১৩৬৭

[৭] *সহীহ মুসলিম* : ৯৭২

[৮] *সহীহ বুখারী* : ৫৬৮; *সহীহ মুসলিম* : ৬৪৭

[৯] *সিলসিলাহ সহীহাহ* : ৭৩৬

[১০] *সিলসিলাহ সহীহাহ* : ৩/২৪৭

[১১] *সহীহ বুখারী* : ১৯৮৫; *সহীহ মুসলিম* : ১১৪৪

- উদ্বৃত্ত পানি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।[১]
- শরীরে উল্কি আঁকতে নিষেধ করেছেন।[২]
- লাগাতার সিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন।[৩] এ ছাড়াও আরও বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞার কথা পবিত্র সুন্নাহয় বিবৃত আছে।

এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাহ হলো মেসওয়াক করা। রাসূল ﷺ বলেন—

> লَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ وفي رواية عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
>
> *যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেকবার ওযূর সময় মেসওয়াক করার আদেশ করতাম। আরেক বর্ণনায় আছে—প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াক করার আদেশ করতাম।[৪]*

অন্য আরেকটি সহীহ হাদীসে আছে—

> اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ
>
> *মেসওয়াক মুখকে পবিত্র করে এবং রবের সন্তুষ্টি বয়ে আনে।[৫]*

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ হলো তাহিয়্যাতুল মাসজিদ। তাহিয়্যাতুল মাসজিদ হলো মসজিদে প্রবেশের পর বসার পূর্বেই দু'রাকাত নফল সালাত আদায় করা। বুখারী ও মুসলিমের হাদীস দ্বারা তাহিয়্যাতুল মাসজিদ প্রমাণিত। মসজিদে প্রবেশের অন্যান্য সুন্নাহ হলো—

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ১৫৬৫

[২] *সহীহ বুখারী* : ৪৬০৪; *সহীহ মুসলিম* : ২১২৫

[৩] *সহীহ বুখারী* : ৭২৯৯; *সহীহ মুসলিম* : ১১০৩

[৪] *মিশকাতুল মাসাবীহ* : ৩৭৬; *মুসনাদে আহমাদ* : ৭৫১৩

[৫] *সুনানুন নাসায়ী* : ০৫

- ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা
- বাম পা দিয়ে বের হওয়া
- ডান পায়ের জুতা আগে পরা
- বাম পায়ের জুতা আগে খোলা

কারও ঘরে বা কামরায় প্রবেশ করার সময় সর্বোচ্চ তিন বার অনুমতি চাওয়া। তিন বারের মধ্যে যদি অনুমতি দেয় তাহলে প্রবেশ করা। অন্যথায় ফিরে যাওয়া। এটাও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

এ প্রবন্ধে আমি শুধু বহুল প্রচলিত কিছু কর্মগত সুন্নাহর দিকে ইঙ্গিত করেছি। এছাড়াও আরও বহু সুন্নাহ রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সুন্নাহর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করার এবং সুন্নাহর অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন।

Contents

রামাদান উপলক্ষ্যে মুসলিম রমণীদের প্রতি একটি বার্তা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিনয়ী ও ধৈর্যধারণকারী মুমিন নারীর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—তারা পুরুষের অনুপস্থিতিতে আল্লাহপ্রদত্ত (অধিকারসমূহ) হিফাযত করে।

অন্যত্র সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন—

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

সুতরাং, তাদের প্রতিপালক তাদের দুআ কবুল করলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের কর্মফল নষ্ট করব না, তাতে সে পুরুষ হোক বা নারী। তোমরা পরস্পরে একই রকম।[১]

তাই হে আল্লাহর বান্দী, আমার মুসলিম বোন, এই বরকতময় মাস উপলক্ষ্যে আমি আপনার জন্য কিছু হাদিয়া নিয়ে এসেছি। আশা করি, আপনি এ হাদিয়া কবুল করবেন। আল্লাহর কাছে কামনা করি, তিনি যেন আমাকে এবং আপনাকে খাঁটি তাওবা করার তাওফীক দান করেন। আমাদের গুনাহগুলো মার্জনা করেন।

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯৫

এখন আমি আপনার সামনে দশটি গুণের কথা তুলে ধরবো। আশা করি, আপনি তা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং বাস্তবায়নের চেষ্টা করবেন।

এক. মুসলিম নারী আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনে। আল্লাহকে রব হিসেবে মানে। মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবী হিসেবে মান্য করে। ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসেবে বিশ্বাস করে। ফলে তার কাজে-কর্মে, কথা-বার্তায় এবং আকীদা-বিশ্বাসে ঈমানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহর আযাবকে ভয় করে।

দুই. মুসলিম নারী ওযূ করে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত খুশূ-খুযূর সাথে আদায় করে। কোনো ব্যস্ততা তাকে সালাত থেকে বিরত রাখতে পারে না। কোনো ব্যস্ততা তাকে ইবাদাত থেকে দূরে রাখতে পারে না। যখন সে সালাতে দণ্ডায়মান হয় তখন দুনিয়ার সব কিছু ভুলে যায়। তার সালাত 'সল্লু কামা রআইতুমুনী'—এর বাস্তব উদাহরণ হয়ে ওঠে। ফলে তার দিন-রাতের চব্বিশ ঘণ্টা সালাতের প্রভাবে প্রভাবিত হতে থাকে। তার সালাত তাকে অশ্লীল ও মন্দ কর্ম থেকে বাধা প্রদান করে। কারণ, সালাত তো গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখার অত্যন্ত কার্যকর একটি মাধ্যম। কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ

নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।[১]

তিন. মুসলিম নারী পর্দার প্রতি গুরুত্বারোপ করে। পর্দাবৃত হওয়াকে সৌভাগ্যের কারণ মনে করে। সে মনে করে, পর্দার মাধ্যমে আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন। তাকে অভদ্র ও অসভ্য লোকদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে হিফাযত করেছেন। তাকে পরিশুদ্ধ থাকার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাই সে আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা আদায় করে। সর্বদা পর্দার বিধান রক্ষা করে। পর্দাবৃত হওয়া ছাড়া গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনে যায় না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ

[১] সূরা আনকাবূত, আয়াত : ৪৫

হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদের, তোমার কন্যাদের এবং মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের (মুখের) ওপর নামিয়ে নেয়।[১]

চার. মুসলিম নারী আন্তরিকভাবে স্বামীর আনুগত্য করে। স্বামীকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে। তার আরামের ব্যবস্থা করে। তাকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং তার কল্যাণ কামনা করে। তার সাথে নরম ভাষায় কথা বলে। কখনো উঁচু আওয়াজে বা রূঢ় ভাষায় কথা বলে না। রাসূল ﷺ বলেছেন—

“

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

যদি কোনো মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রামাদানে সিয়াম রাখে এবং স্বামীর আনুগত্য করে তাহলে তাকে বলা হবে, জান্নাতের যে-দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারো।[২]

পাঁচ. মুসলিম নারী তার সন্তানদের আল্লাহর আনুগত্যের ওপর প্রতিপালন করে। তাদের সহীহ আকীদা শিক্ষা দেয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ও তার রাসূলের ভালোবাসার বীজ বপন করে। তাদের গুনাহ থেকে দূরে রাখতে এবং মন্দ আখলাক থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকে। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

হে মুমিনগণ, নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করো সেই আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তাতে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাব ও কঠিন হৃদয়ের ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহর কোনো হুকুমে তার অবাধ্যতা করে না এবং সেটাই করে, যার নির্দেশ তাদের দেওয়া হয়।[৩]

[১] সূরা আহযাব, আয়াত : ৫৯

[২] *মুসনাদে আহমাদ* : ১৬৬৪

[৩] সূরা তাহরীম, আয়াত : ০৬

ছয়. মুসলিম নারী কোনো গায়রে মাহরামের সাথে নির্জনে অবস্থান করে না। কারণ, রাসূল ﷺ বলেন—

“

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

যখন কোনো নারী কোনো পুরুষের সাথে নির্জনে অবস্থান করে তখন শয়তান সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে উপস্থিত হয়।

মুসলিম নারী মাহরাম ছাড়া সফরে বের হয় না। অত্যধিক প্রয়োজন ছাড়া বাজার কিংবা পাবলিক প্লেসে গমন করে না। যদি কোথাও যেতেই হয় তাহলে পরিপূর্ণ পর্দার সাথে শালীনভাবে গমন করে।

সাত. মুসলিম নারী পুরুষের বিশেষায়িত বেশ-ভূষা গ্রহণ করে না। সহীহ হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন—

“

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

আল্লাহ তাআলা নারীর সাদৃশ্য গ্রহণকারী পুরষ এবং পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণকারী নারীর ওপর লানত বর্ষণ করেন।[১]

মুসলিম নারী অমুসলিম নারীদের বিশেষায়িত বেশ-ভূষা বা সাজ-সজ্জাও গ্রহণ করে না। সহীহ হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন—

“

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

যে-ব্যক্তি যে-সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য রাখবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।[২]

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৫৫৪৬; *জামি তিরমিযী* : ২৭৮৪

[২] *মুসনাদে আহমাদ* : ৪৯৩৬; সুনানু আবি দাউদ : ৪০৩১

আট. মুসলিম নারী অন্য নারীদের মাঝে দাওয়াতের কাজ করে। তাদের সাথে কোমল ভাষায় কথা বলে। সৌজন্য সাক্ষাৎ করে। খোঁজখবর নেয়। মোবাইল, ইসলামী অডিও লেকচার এবং ছোট ছোট বইয়ের মাধ্যমে তাদের আল্লাহমুখী করার চেষ্টা করে। আবার সে যা বলে তার ওপর নিজেও আমল করে। নিজেকে এবং অন্যান্য নারীকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে ব্যাকুল ও উদগ্রীব থাকে। সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূল ﷺ বলেছেন—

❝

لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا ، خَيْرٌ لَكَ مِن حُمْرِ النَّعَم

আল্লাহ তাআলা তোমার দ্বারা একজন ব্যক্তিকেও যদি হেদায়াত দান করেন, তবে সেটা তোমার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উট দান করার চেয়েও উত্তম।[১]

নয়. মুসলিম নারী অন্তরকে কুচিন্তা থেকে পবিত্র রাখে। সন্দেহজনক কাজ-কর্ম থেকে দূরে থাকে। দৃষ্টিকে হারাম জিনিস দেখা থেকে হিফাযত করে। কানকে গান-বাজনা এবং অশ্লীল কথা-বার্তা শোনা থেকে রক্ষা করে। এক কথায়, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজে ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখে। সে জানে, এটাই হলো তাকওয়ার মূল কথা। রাসূল ﷺ বলেন—

❝

তোমরা আল্লাহকে লজ্জা করার মতো লজ্জা করো। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, 'আলহামদু লিল্লাহ,' আমরা তো লজ্জা করি। তিনি বললেন, এ লজ্জা নয়, আল্লাহকে পরিপূর্ণ লজ্জা করার অর্থ—তুমি তোমার মস্তিষ্ক ও চিন্তা-চেতনার হিফাযত করবে। তুমি উদর ও খাবারের হিফাযত করবে এবং মৃত্যু ও মৃত্যু-পরবর্তী পরিণতিকে বেশি বেশি স্মরণ করবে। যে-ব্যক্তি আখিরাত কামনা করে, সে দুনিয়ার সৌন্দর্য ছেড়ে দেয়। অতএব, যে-ব্যক্তি এ কাজগুলো মেনে চলে, সে অবশ্যই আল্লাহকে লজ্জা করার মতো লজ্জা করে।[২]

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ২৮৪৭; *সহীহ মুসলিম* : ২৪০৬

[২] *জামি তিরমিযী* : ২৪৫৮

দশ. সর্বশেষ যে-বিষয়টির কথা আমি আপনাকে বলতে চাই, তা হলো সময়ের অপচয় করবেন না। কারণ, একজন মুসলিম নারী তার সময়ের হিফাযত করে। তার দিনরাতকে অহেতুক ও অনর্থক কাজে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে। সে গীবত করে না। চোগলখুরি করে না। অপরকে গালি দেয় না। খেল-তামাশায় সময় নষ্ট করে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

যারা নিজেদের দ্বীনকে ক্রীড়া-কৌতুকের বিষয় বানিয়েছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে, তুমি তাদের পরিত্যাগ করো।[১]

অপর আয়াতে যারা দুনিয়াতে নিজেদের জীবন ধ্বংস করেছে তাদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, কিয়ামতের দিন তারা বলবে—

يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا

হায় আফসোস! আমরা তো এ বিষয়ে বড় অবহেলা করেছি।[২]

হে আল্লাহ, আপনি আমার মুসলিম বোনদের হেদায়াত দান করুন। তাদের অন্তর ঈমানের নূরে নূরান্বিত করুন। তাদের আপনার সন্তুষ্টি অনুযায়ী জীবন-যাপন করার তাওফীক দান করুন।

[১] সূরা আনআম, আয়াত : ৭০

[২] সূরা আনআম, আয়াত : ৩১

Contents

রামাদানে মুসলিমবিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ

নিশ্চয় এটাই তোমাদের দ্বীন। সমস্ত নবী এই অভিন্ন দ্বীনেরই দাওয়াত দিতেন। আর আমি তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং, তোমরা আমার ইবাদাত করো।[১]

অন্যত্র বলেন—

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

নিশ্চয় মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।[২]

নুমান ইবনু বাশির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

[১] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৯২

[২] সূরা হুজুরাত, আয়াত : ১০

“

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

পারস্পরিক সম্প্রীতি, দয়ার্দ্রতা ও সহমর্মিতার দিক দিয়ে মুমিনদের দৃষ্টান্ত একটি মানব দেহের মতো। যখন তার একটি অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন তার সমগ্র দেহ তাপ ও অনিদ্রার যন্ত্রণা ভোগ করে।[১]

রামাদান মাস একটি বরকতময় মাস। ইবাদাত-বন্দেগীর মাস। সহমর্মিতার মাস; কিন্তু আজ এই বরকতময় মাসেই মুসলিমরা দুর্বিষহ জীবন-যাপন করছে। চারিদিক থেকে শত্রুরা তাদের ওপর হামলে পড়ছে। চতুর্মুখী ফিতনা তাদের ঈমান-আমলকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। বর্তমান সময়ে মুসলিমবিশ্ব যে-সকল সমস্যার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে সেগুলো হচ্ছে—

এক. কমিউনিজম। এই মতবাদ মানুষের অন্তরে নাস্তিকতার বীজ বপন করছে। সম্পদ, অর্থনীতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের ধ্যান-ধারণা পরিবর্তন করে দিচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের ইন্ধন যোগাচ্ছে।

দুই. পুঁজিবাদ। এই মতবাদ ও মানসিকতা মুসলিমবিশ্বের সাথে মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ে লিপ্ত হচ্ছে। মানুষকে ভোগবাদে অভ্যস্ত হতে শেখাচ্ছে। অধিক মুনাফার লালসায় গরীবের হক লুণ্ঠন করা শেখাচ্ছে। নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসাবে উপস্থাপন করছে। জীবনকে খেল-তামাশায় রূপান্তরিত করছে। সমাজে অশ্লীলতার বিস্তার ঘটাচ্ছে।

তিন. ধর্মনিরপেক্ষতা। এই মতবাদ দ্বীন ও দুনিয়ার মাঝে বিরোধের প্রাচীর দাঁড় করাচ্ছে। ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে—এই যুক্তিতে যে, ধর্ম জাতিগত পার্থক্য বা বিরোধ সৃষ্টি করে। এই কুফুরী দর্শন ধর্মকে ব্যক্তি জীবনে আবদ্ধ করে ফেলেছে। বিশেষ করে ইসলামকে জীবনব্যবস্থা থেকে উৎখাত করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে।

চার. ফ্রীম্যাসন। এই মতবাদটি ইহুদীরা আবিষ্কার করেছে ইসলামকে সুকৌশলে ধ্বংস করার জন্য। বাহ্যত যদিও এই মতবাদ সমস্ত জাতিসত্তাকে একীভূত হওয়ার আহ্বান

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৬০১১; *সহীহ মুসলিম* : ২৫৮৬

করে—তবে বাস্তবে সুকৌশলে মুসলিমদের ঈমান-আকীদা ধ্বংস করে। বর্তমানে এই ইহুদীবাদী মতবাদ ও তার কুপ্রভাব খুব দ্রুত সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে।

এই মতবাদগত ফিতনা ছাড়াও মুসলিম বিশ্ব আজ সশস্ত্র সন্ত্রাসের শিকার। যে-সব মুসলিম ভূখণ্ড সশস্ত্র সন্ত্রাসের শিকার সেগুলোর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো—

এক. ফিলিস্তিন। এই ভূখণ্ডটিকে আজ মুসলিমবিশ্ব থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। মসজিদুল আকসা অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। সকাল-বিকাল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে হত্যা করা হচ্ছে। উমার ইবনুল খাত্তাবের ক্রোধ, সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর জিহাদ এবং ইবনু তাইমিয়ার সততা ব্যতীত ফিলিস্তিন ইসলামী মানচিত্রে ফিরিয়ে আনা কিছুতেই সম্ভব নয়।

দুই. আফগানিস্তান। এই ভূখণ্ডটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। শহরগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। মসজিদগুলো গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অধিবাসীদের গৃহহীন করা হয়েছে। মুসলিম-ভূমিতে কমিউনিজমের চাষ করা হচ্ছে। হাজার হাজার নিরপরাধ নারী-পুরুষ খাবারের জন্য এক টুকরো রুটিও খুঁজে পাচ্ছে না। পরার জন্য এক টুকরো কাপড় পাচ্ছে না। মাথা গোঁজার সামান্য ঠাঁই পাচ্ছে না। সেখানে আজ শয়তানের দলের সাথে আল্লাহর দলের ঘোরতর লড়াই চলছে।

তিন. রাশিয়ায় ইসলামী সাম্রাজ্য আজ টুকরো টুকরো। আযারবাইযান, উযবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান অমানবিক নির্যাতন-নিপীড়ন এবং অভাব-অনটনের শিকার। আছে কি কেউ তাদের সাহায্য করার?

এছাড়াও মুসলিম নারীকে আজ ইজ্জত-আব্রু এবং ধর্ম রক্ষা করার জন্য লড়াই করতে হচ্ছে। যুবকেরা চরিত্রবিধ্বংসী নানা ফিতনায় আক্রান্ত হচ্ছে। ইসলামী বিশ্বের পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ—সর্বত্র মুসলিমদের ধরে ধরে খ্রিস্টান বানানো হচ্ছে।

মুসলিমদের মাঝেও অসংখ্য দল ও উপদল সৃষ্টি হয়েছে। এই সব বিভক্তি মুসলিমদের ভ্রাতৃত্ব নষ্ট করছে। ঐক্য দুর্বল করে দিচ্ছে। শক্তি নিঃশেষ করে দিচ্ছে।

মুসলিমদের এখন করণীয় কী? কীভাবে আমরা এই সর্বপ্লাবী আগ্রাসন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবো? এ বিষয়ে নিম্নে কিছু আলোচনা তুলে ধরছি—হয়তো কোনো মুসলিম ভাই আমার কথাগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

মুসলিমদের জন্য এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে-বিষয়টি তা হলো হতাশ না হওয়া। ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্যাগুলোর মুকাবেলা করা। মুসলিম ভাই-বোনদের রক্ষা করার জন্য সাধ্যমতো এগিয়ে আসা। কোনো মুসলিমই নিজেকে ছোট মনে না করা। প্রত্যেক মুসলিমের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে। প্রত্যেকেই ভালো কিছু করার ক্ষমতা রাখে।

আমাদের এখন অবশ্য কর্তব্য হলো, প্রত্যেক ফরয সালাতের পর, তাহজ্জুদের সময় এবং দুআ কবুলের বিশেষ বিশেষ সময়গুলোতে মুসলিমদের বিজয় এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য দুআ করা।

বিশেষ করে মানুষকে তাকওয়া ও আল্লাহভীতির দিকে আহ্বান করা। জলে-স্থলে যত বিপদাপদ তা তো আমাদেরই হাতের কামাই; কর্মের ফল। মহান আল্লাহ বলেন—

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ

যখন তোমরা এমন মুসিবতে আক্রান্ত হলে, যার দ্বিগুণ মুসিবতে তোমরা (শত্রুদের) আক্রান্ত করেছ, তখন কি তোমরা এরূপ কথা বলো যে, এ মুসিবত কোত্থেকে এসে গেল? বলো, এটা তোমাদের নিজেদের থেকেই এসেছে।[১]

অতীতে মুসলিম উম্মাহ বিজয়ের সংবাদ শুনে শুনে রামাদান অতিবাহিত করত; কিন্তু যখন মুসলিমদের ঈমান-আকীদা দুর্বল হয়ে যায় তখন থেকেই দুঃখ-দুর্দশার সংবাদ শুনে শুনে রামাদান কাটাতে হয়। এখনো যদি মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর দিকে ফিরে আসে তাহলে আবারও ফিরে আসবে আল্লাহর সাহায্য । আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

হে মুমিনগণ, তোমরা যদি আল্লাহর দ্বীন-এর সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের দৃঢ়পদ রাখবেন।[২]

---

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৬৫

[২] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ০৭

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

বিজয় তো কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে—যিনি পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও হিকমতের মালিক।[1]

إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ

আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করলে কেউ তোমাদের পরাস্ত করতে পারবে না।[2]

ইয়া আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে আপনার ওয়াদার বাস্তবায়ন চাই। ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাদের দৃঢ়পদ রাখুন। আমাদের কাফের সম্প্রদায়ের ওপর বিজয়ী করুন।

[১] সূরা আনফাল, আয়াত : ১০

[২] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৬০

সময়ের হিফাযত করুন

সময় হলো বহতা নদীর মতো। কুলকুল রবে নিজ গতিতে বয়ে যায়। কারও জন্য বিন্দুমাত্র অপেক্ষা করে না। একসময় সন্ধ্যা নেমে আসে। শক্তিশালী ও প্রভাবশালী দেহটা নিথর পড়ে থাকে। প্রিয় মানুষ কয়েকদিন কান্নাকাটি করে। এরপর সবাই ভুলে যায়। সকলে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে; কিন্তু সময় তার নিজ গতিতেই চলতে থাকে।

যারা দুনিয়ায় খেল-তামাশা ও আমোদ-ফুর্তিতে সময় নষ্ট করেছে কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে আল্লাহর প্রশ্নোত্তরের বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন—

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾

আল্লাহ বলবেন, তোমরা পৃথিবীতে কত বছর ছিলে? তারা বলবে, আমরা এক দিন বা এক দিনেরও কম সময় ছিলাম। (আমাদের ভালো করে মনে নেই) কাজেই যারা গুনেছে তাদের জিজ্ঞাসা করুন। আল্লাহ বলবেন, তোমরা অল্পকালই ছিলে। কতই-না ভালো হতো, যদি এ বিষয়টা তোমরা আগেই বুঝতে। তবে কি তোমরা মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদের উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেছি এবং আমার কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে না? মহামহিম আল্লাহ, যিনি প্রকৃত বাদশাহ। তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক।[১]

[১] সূরা মুমিনূন, আয়াত : ১১২-১১৬

এক বুযুর্গ বলেন—'জীবন তো এমনিতেই ছোট। গাফলতের মাধ্যমে একে আর ছোট কোরো না।'

কত বাস্তবসম্মত কথা! গাফলত ও উদাসীনতা কত মানুষের সময়কে যে অর্থহীন করে রেখেছে!

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

❝

نِعمَتَانِ مَغبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ: اَلصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ

দুটি নিয়ামত এমন আছে, যার ব্যাপারে বহু লোক ধোঁকায় নিপতিত। একটি হলো সুস্থতা, অপরটি হলো অবসর।[১]

বাস্তবেও দেখা যায়, কত মানুষ সুস্থ-স্বাভাবিক। ব্যস্ততামুক্ত; কিন্তু তাদের সময়গুলো অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জীবনপ্রদীপ ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছে। সময় থেকে সে কোনো উপকার লাভ করছে না। সময়কে সে কোনো ফলদায়ক কাজে ব্যবহার করছে না। রাসূল ﷺ বলেছেন—

❝

لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ

চারটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ব্যতীত কিয়ামতের দিন বান্দার কদম চুল পরিমাণও নড়বে না। এর মধ্যে একটি হলো, জীবনকে সে কোন কাজে নিঃশেষ করেছে?[২]

জীবন হলো কিছু সময়ের সমষ্টি। জীবন হলো এক গুরুত্বপূর্ণ ধনভাণ্ডার। যে তা আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করবে সে কিয়ামতের দিন তার ধনভাণ্ডার ফিরে পাবে—যে-দিন সন্তানসন্ততি কিংবা ধন-সম্পদ কোনো কাজে আসবে না—তবে যে-ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে বিশুদ্ধচিত্ত নিয়ে সে-ই কেবল মুক্তি পাবে।

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৬০৪৯

[২] *জামি তিরমিযী* : ২৪১৬

আর যে সময়কে আল্লাহর নাফরমানী ও খেল-তামাশায় ব্যয় করবে সে চূড়ান্ত পর্যায়ের লজ্জিত হবে এবং বলবে, হায় আফসোস, দুনিয়াতে আমরা কী ভুল করে এলাম।

দিনরাত মূলত একটি বাহনের ন্যায়। কাউকে তা চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের দিকে নিয়ে যায়। আবার কাউকে নিয়ে যায় চিরস্থায়ী দুর্ভাগ্যের দিকে।

আমাদের সালাফগণ সময় হিফাযতের জন্য নিজেরাই নিজেদের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। এ প্রসঙ্গে তাদের অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ জুনাইদ ইবনু মুহাম্মাদ-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি মৃত্যুশয্যায়ও কষ্ট করে কুরআন তিলাওয়াত করে যাচ্ছিলেন। তখন তার সন্তানরা তাকে বলেন, আপনি তো নিজেকে পরিশ্রান্ত করে ফেলছেন। তিনি উত্তর দেন, 'আমি না করলে কে করবে? এ কাজে আমার চেয়ে বেশি হকদার কে?'

তাবেয়ী আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ রাহিমাহুল্লাহ রাতের অধিকাংশ সময় সালাত আদায় করতেন। একবার তার এক ছাত্র তাকে বলেন, 'আপনি যদি একটু বিশ্রাম নিতেন!' তিনি উত্তর দেন, 'আরে, বিশ্রাম নেওয়ার জন্যই তো সালাত পড়ছি।' অর্থাৎ দুনিয়াতে যত বেশি সালাত পড়তে পারব আখেরাতে তত বেশি বিশ্রাম নিতে পারব।

একবার সুফিয়ান সাওরী রাহিমাহুল্লাহ হারামে বসে কয়েকজন লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন; কিন্তু হঠাৎ শঙ্কিত ও ব্যস্তসমস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বলতে থাকেন, আমরা এখানে বসে আছি। অথচ সূর্য কিন্তু তার কাজ ঠিকই করে যাচ্ছে!

সালাফদের কেউ কেউ দিবারাত্রিকে কয়েক ভাগে ভাগ করতেন—এক ভাগ নফল সালাতের জন্য। এক ভাগ কুরআন তিলাওয়াতের জন্য। এক ভাগ যিকির-আযকারের জন্য। এক ভাগ ইলম অর্জনের জন্য। এক ভাগ হালাল উপার্জনের জন্য এবং এক ভাগ ঘুমের জন্য। মোটকথা, খেল-তামাশার জন্য তাদের কোনো সময় ছিল না।

কিন্তু পরবর্তীদের অধিকাংশই সময় নষ্ট করার ফিতনায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। ঘুম, অলসতা, অনর্থক কথা-বার্তা—ইত্যাদিতে বেশুমার সময় নষ্ট করে দেয়। সরাসরি গুনাহের আসরে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারলেও এমন অনেক আসরে অংশগ্রহণ করে যেগুলো গুনাহের দিকে ধাবিত করে।

মানুষ ইচ্ছা করলে সালাতকে কেন্দ্র করে জীবনের সময়গুলো সুবিন্যস্তভাবে ব্যবহার করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

নিশ্চয় সালাত মুমিনদের ওপর এমন অবশ্য পালনীয় কাজ—যা সময়ের সাথে আবদ্ধ।

তাই কেউ ইচ্ছা করলে সালাতের রুটিন অনুযায়ী তার সময় বিন্যস্ত করে নিতে পারে। ফজরের পরের সময় তিলাওয়াত, যিকির-আযকার, 'তাদাব্বুর[১]' ও কুরআন মুখস্থ করার কাজে ব্যয় করবে। সূর্য ওপরে ওঠার পর থেকে যোহর পর্যন্ত কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, হালাল উপার্জন এবং ইলম অন্বেষণের কাজে ব্যবহার করবে। যোহরের পর থেকে চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ীরা তাদের কাজ করবে। আর শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন গবেষণাপত্র এবং ইতিহাস অধ্যয়নে সময় কাটাবে। আসরের পর থেকে মাগরীব পর্যন্ত পাঠাগারে সময় দেবে। মাগরিবের পরের সময় পরিচিতদের সাথে সাক্ষাতে ব্যয় করবে। আর ইশার পরের সময়টা পরিবারের জন্য বরাদ্দ রাখবে। এরপর ঘুম এবং কিয়ামুল লাইল। বৃহস্পতিবার বিশ্রাম এবং বৈধ বিনোদন। শুক্রবার ইবাদাত, তিলাওয়াত, যিকির-আযকার এবং জুমআর প্রস্তুতি।

তদ্রুপ কেউ ইচ্ছা করলে রামাদানের সময়কে সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারে।

কারণ, সিয়াম পালনকারী দিনের বেলায় রান্না-বান্না, খাবার-দাবার ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত থাকে। ফলে সারা দিন অনেক সময় বেঁচে যায়। রোজাদার দিনের এই দীর্ঘ সময়কে ইবাদাত-বন্দেগীর কাজে ব্যবহার করতে পারে।

আফসোস! আজ কত মানুষ সিয়ামের অর্থই বোঝে না। হেলায়-ফেলায় এবং গাফলতি-উদাসীনতায় রামাদানের বরকতময় সময়গুলো নষ্ট করে ফেলে। দিনের সময়গুলো নিদ্রায় কাটিয়ে দেয়। রাতের সময়গুলো অনর্থক কাজে অতিবাহিত করে।

ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাদের সময় হিফাযতের তাওফীক দান করুন। আমাদের অবিচল ও দৃঢ়পদ রাখুন এবং আপনার আনুগত্যে আমাদের ব্যবহার করুন।

---

[১] কুরআন নিয়ে গবেষণা।

রামাদান : ভ্রাতৃত্ব প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্য

সমস্ত মুসলিম এক দেহ এক প্রাণ। মুসলিমদের সম্পর্কের এই স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—মুসলিমরা এক দেহের মতো। যদি তার চক্ষু ব্যথিত হয় তাহলে তার সমস্ত শরীর ব্যথিত হয়।

এই যে একতা ও ভ্রাতৃত্ব—এর ভিত্তিই হলো ইসলাম। ইসলামের সুশীতল ছায়া-ই তাদের একতাবন্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করে। এটা কোনো ব্যক্তি বা দলের কারিশমা নয়। এটা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

এবং তিনি তাদের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তুমি যদি পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদও ব্যয় করতে তবে তাদের হৃদয়ে এ সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে পারতে না; কিন্তু তিনি তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমতারও মালিক, হিকমতেরও মালিক।[১]

মুসলিমদের নিকট রক্ত, ভাষা, দেশ বা জাতিগত ঐক্য বলতে কিছু নেই। তাদের একতা কোনো সীমিত গণ্ডিতে আবন্ধ নয়। তাদের একতা বহু বিস্তৃত। তাদের একতার উৎস হলো দ্বীন ও ইসলাম। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'—

---

[১] সূরা আনফাল, আয়াত : ৬৩

এই কালেমা-ই তাদের ঐক্যের মানদণ্ড। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হয় তাকওয়ার নিক্তিতে এবং ইলম ও আমলের ভিত্তিতে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

আমি তোমাদের সকলকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পারো। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব বিষয়ে অবগতি রাখেন।[১]

নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর মুহাম্মাদ ﷺ যখন লোকদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দেন তখন হাবশার বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ডাকে সাড়া দেন। পারস্যের সালমান ও রোমের সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহুমা তার প্রতি ঈমান আনেন। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর নিকট প্রিয়পাত্র হয়ে যান। অপরদিকে বংশীয় গর্ব থাকার পরেও ওয়ালীদ ইবনু মুগীরা, আবু জাহল, আবু লাহাব পেছনে পড়ে থাকে। নিজেদের জন্য অনিবার্য ধ্বংস ডেকে আনে।

কিন্তু বংশ-মর্যাদা তো তখন কোনো কাজ আসবে না। কারণ, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন—

“

مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

যার আমল তাকে পিছিয়ে দেবে তার বংশ-মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিতে পারবে না।[২]

বস্তুত ইসলাম একটি বৈশ্বিক সমাজ-ব্যবস্থা। প্রতিটি মুমিন-মুসলিম এর একেকজন সদস্য। ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট গোত্র বা দেশের মুক্তির জন্য আবির্ভূত হয়নি। ইসলাম তো আরব, আজম, হিন্দুস্তান, তুর্কিস্তান, আফ্রিকা, ইউরোপ—তথা সমগ্র বিশ্বের মুক্তির জন্যই আবির্ভূত হয়েছে। এই যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু—তিনি ছিলেন কুরাইশী; বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন হাবশী; সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু

---

[১] সূরা হুজুরাত, আয়াত : ১৩

[২] *সহীহ মুসলিম* : ২৬৯৯

ছিলেন রুমী; সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ফারসী; সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন কুর্দী; মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন তুর্কী; আল্লামা ইকবাল রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন হিন্দুস্তানী; একমাত্র 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'—এই কালেমাই তাদের সকলকে এক পতাকাতলে নিয়ে এসেছে।

রামাদানে এই বিশাল ঐক্যের বিষয়টি আরও সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। একই মাস। একই সিয়াম। একই কিবলা। একই পথ। একই গন্তব্য।

অধিকন্তু রামাদানে আমরা সবাই এক ইমামের পেছনে সালাত আদায় করি। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

আর তোমরা রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু করো।[১]

অন্যত্র বলেন—

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

তোমরা সকলে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হও।[২]

আল্লাহ তাআলা আমাদের সিয়াম রাখার আদেশ দিয়ে বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে মুমিনগণ, তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছে—যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।[৩]

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ৪৩

[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৩

[৩] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৩

আমাদের হজ এক। হজের সময় এক। হজের স্থান এক। ঘোষিত হয়েছে—

فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ

অতঃপর তোমরা যখন আরাফাহ থেকে রওনা হবে তখন মাশআরুল হারামের নিকট[১] আল্লাহর যিকির করো। আর তার যিকির তোমরা সেভাবেই করবে, যেভাবে তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।[২]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে তার রজ্জু আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। বিচ্ছিন্নতা ত্যাগ করে এক হয়ে চলার আদেশ করেছেন। কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

আল্লাহর রশিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখো এবং পরস্পরে বিভেদ করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তা স্মরণ রাখো। একটা সময় ছিল, যখন তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরসমূহ জুড়ে দিয়েছেন। ফলে তার অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়েছ।[৩]

বিচ্ছিন্নতা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

এবং তোমরা সেই সকল লোকের মতো হয়ো না, যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসার পরও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল ও আপসে মতভেদ সৃষ্টি করেছিল। এরূপ লোকদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।[৪]

[১] এ এলাকাটি মুযদালিফার নিকটে অবস্থিত।

[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৯৮

[৩] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০৩

[৪] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০৫

রাসূল ﷺ বলেছেন—

❝

إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا ، حَتَّى لَا يَبْغِي بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا يَفْخَرُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

নিশ্চয় আল্লাহ আমার নিকট ওহী প্রেরণ করে বলেছেন, তোমরা বিনয় অবলম্বন করো। একজনের ওপর অন্যজন সীমালঙ্ঘন করো না এবং কেউ কারও ওপর গর্ব করো না।[১]

আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত অপর একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

❝

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

মুমিন মুমিনের জন্য ইমারত সদৃশ। একজন আরেকজনকে শক্তিশালী করে।[২]

অন্য হাদীসে আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে—

❝

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يَخْذُلُهُ ، وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا ، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ ، حَرَامٌ دَمُهُ ، وَمَالُهُ ، وَعِرْضُهُ

মুসলিম মুসলিমের ভাই। কেউ কারও ওপর যুলুম করে না। কেউ কাউকে অপদস্থ করে না। কেউ কাউকে তুচ্ছ মনে করে না। মুসলিম ভাইকে হেয় জ্ঞান করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অকল্যাণকর। প্রতিটি মুসলিমের জান, মাল এবং ইজ্জত অপর মুসলিমের জন্য হারাম।[৩]

এই যে একতা ও ভ্রাতৃত্ব—এর কিছু স্বতন্ত্র দাবি আছে। একজন মুসলিম হিসাবে এই দাবিগুলো আমি এড়িয়ে যেতে পারি না। যেমন—অপর মুসলিম ভাইয়ের

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ২৮৬৫

[২] *সহীহ বুখারী* : ২৪৪৬

[৩] *সহীহ মুসলিম* : ২৫৬৪

খোঁজ-খবর নেওয়া। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার সাক্ষাতে যাওয়া। অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া। সাক্ষাৎ হলে সালাম দেওয়া। হাসিমুখে কথা বলা। হাঁচির উত্তর দেওয়া। তার দাওয়াত কবুল করা। জানাযায় উপস্থিত হওয়া। তার অনুপস্থিতিতে তার জন্য দুআ করা। তার ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষণ করা। প্রয়োজন পূরা করা। তার পাশে দাঁড়ানো। অত্যাচারিত হলে সাহায্য করা। তার কল্যাণ কামনা করা। তাকে সদুপদেশ দেওয়া । এছাড়াও আরও অনেক হক রয়েছে। প্রতিটি মুসলিমই আমার ভাই। প্রত্যেকের সাথেই আমার ঈমানী ও কুরআনী বন্ধন রয়েছে। এই বন্ধন আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর মুহাম্মাদ ﷺ সেই বন্ধনের দাবি ও হকের প্রায়োগিক রূপরেখা দেখিয়ে গিয়েছেন।

ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাদের মাঝে মুহাব্বত সৃষ্টি করুন। আমাদের বিচ্ছিন্নতা দূর করুন এবং আমাদের সবাইকে একতাবদ্ধ করুন।

রামাদান : দাওয়াতের বরকতময় মৌসুম

দাওয়াত অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। এটা মূলত নবী-রাসূলদের মিশন। প্রত্যেক নবীই তার সম্প্রদায়কে দাওয়াত দিয়েছেন এবং ইলম শিক্ষা দিয়েছেন। প্রত্যেকেই বলেছেন—

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই।[১]

প্রত্যেক দাঈ-ই তার সম্প্রদায়কে বলেছেন—

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না।[২]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

---

[১] সূরা মুমিনূন, আয়াত : ৩২

[২] সূরা শুআরা, আয়াত : ১২৭

তুমি আপন প্রতিপালকের পথে মানুষকে ডাকবে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে। আর (যদি কখনো বিতর্কের প্রয়োজন পড়ে তাহলে) তাদের সাথে বিতর্ক করবে উৎকৃষ্ট পন্থায়।[১]

অন্যত্র বলেন—

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

(হে নবী) বলে দিন, এটাই আমার পথ, আমি 'বাসীরাত'-এর সাথে আল্লাহর দিকে ডাকি এবং যারা আমার অনুসরণ করে তারাও। আল্লাহ (সব রকম) শিরক থেকে পবিত্র। যারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।[২]

উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত আয়াতে 'বাসীরাহ' বলে উপকারী ইলম এবং নেক আমলকে বোঝানো হয়েছে।

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? যে আল্লাহর দিকে ডাকে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি আনুগত্য স্বীকারকারীদের একজন।[৩]

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর দিকে দাওয়াত প্রদানের পাঁচটি আদাব, পাঁচটি উপায় এবং পাঁচটি সুফল রয়েছে।

---

[১] সূরা নাহল, আয়াত : ১২৫

[২] সূরা ইউসুফ, আয়াত : ১০৮

[৩] সূরা ফুসসিলাত, আয়াত : ৩৩

আদবগুলো হলো—

এক. ইখলাস এবং আল্লাহর সঙ্গে সততা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

তাদের কেবল এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে।[১]

সহীহ হাদীসে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

তিন ব্যক্তিকে প্রথম জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এদের মধ্যে একজন হলো, এমন আলেম যে মানুষের মাঝে আলেম হিসেবে প্রসিদ্ধি পাওয়ার জন্য ইলম শিখেছে। আর দুনিয়াতে তাকে আলেম বলাও হয়েছে।[২]

দুই. যে-বিষয়ের দাওয়াত দেবে প্রথমে নিজে সে-বিষয়ের ওপর আমল করবে। কারণ, অন্যকে দাওয়াত দেওয়া আর নিজে সে-কাজ থেকে দূরে থাকা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও লজ্জাকর বিষয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

তোমরা কি অন্য লোকদের পুণ্যের আদেশ করো আর নিজেদের ভুলে যাও—অথচ তোমরা কিতাবও তিলাওয়াত করো। তোমরা কি এতটুকুও বোঝো না?[৩]

তিন. নম্রতা ও কোমলতার সাথে দাওয়াত দেওয়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

---

[১] সূরা বাইয়িনা, আয়াত : ৫

[২] *সহীহ মুসলিম* : ১৯০৫

[৩] সূরা বাকারা, আয়াত : ৪৪

তোমরা তার সাথে নরম ভাষায় কথা বলবে। হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা (আল্লাহকে) ভয় করবে।[১]

অন্যত্র বলেন—

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

(হে নবী,) আল্লাহর রহমতেই তুমি তাদের সাথে কোমল আচরণ করেছ। তুমি যদি রূঢ় প্রকৃতির ও কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে গিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত।[২]

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

"

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا

তোমরা সহজ করো। কঠিন কোরো না। সুসংবাদ দাও। আতঙ্কিত কোরো না।[৩]

চার. পর্যায়ক্রমে দাওয়াত দেওয়া। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ব্যাপারে আগে দাওয়াত দেওয়া। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ-ও এমন করেছেন; অধিকন্তু ইয়ামানে পাঠানোর সময় মুআয রাযিয়াল্লাহু-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—

"

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا لَهُ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.

---

[১] সূরা ত-হা, আয়াত : ৪৪

[২] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৫৯

[৩] *সহীহ বুখারী* : ৬৯; *সহীহ মুসলিম* : ৩৩৬৫

তুমি আহলে কিতাবদের এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। প্রথমে তাদের এই সাক্ষ্য দেওয়ার দাওয়াত দেবে যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আল্লাহর রাসূল।' যদি তারা তা মেনে নেয় তাহলে তাদের জানাবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন।[১]

পাঁচ. প্রত্যেককে তার উপযোগী ও প্রয়োজনীয় ভাষায় সম্বোধন করা। অর্থাৎ গ্রাম্য ও শহুরে ব্যক্তির ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ভাষা-শৈলী ব্যবহার করা। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তির সঙ্গে তাদের উপযোগী ভাষা ব্যবহার করা। তার্কিকের সঙ্গে যুক্তিপূর্ণ ভাষায় সুষম শৈলীতে কথা বলা এবং অনুগত ব্যক্তির সাথে সাধারণভাবে দাওয়াত দেওয়া। মহান আল্লাহ বলেন—

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

বস্তুত যাকে হিকমাহ দান করা হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে।[২]

উপায়গুলো হলো—

এক. ব্যক্তিগত দাওয়াত। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তিবিশেষকে বিশেষ কোনো বিষয়ে পৃথকভাবে দাওয়াত দেওয়া।

দুই. ব্যাপকভিত্তিক দাওয়াত। এটা হতে পারে কোনো সম্মেলনে। কিংবা কোনো নসীহার মজলিসে। এ ধরনের দাওয়াতে একসাথে অনেক মানুষের উপকার হয়ে থাকে।

তিন. তালিবে ইলমদেরকে তাদের শাস্ত্রীয় বিষয়ে পাঠদান করা। এটা কেবল বিশেষজ্ঞ আলেমদের কাজ। জনসাধারণের কাজ নয়।

চার. চিঠিপত্র প্রেরণ কিংবা ইসলামী বইপত্র বিতরণের মাধ্যমে। এতেও বিপুলসংখ্যক মানুষের উপকার হয়ে থাকে।

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৬৮৫১; *সহীহ মুসলিম* : ১৯

[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৬৯

পাঁচ. হকের কালিমাকে উন্নীত করার লক্ষ্যে আধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার করা।

সুফলগুলো হলো—

এক. নবী-রাসূলদের উত্তরাধিকারীর মর্যাদা লাভ করা। কারণ, তারাই তো ছিলেন দাওয়াতের মূল জিম্মাদার। তারাই তো প্রথম দা'ঈ। দাওয়াতের ক্ষেত্রে তারাই তো ছিলেন পুরোধা ব্যক্তিত্ব।

দুই. সমুদ্রের মাছ থেকে গর্তের পিপীলিকা পর্যন্ত সৃষ্টিকুলের সকলের ক্ষমাপ্রার্থনা লাভ করা। মানুষকে ভালো কাজের শিক্ষাদানকারীর ব্যাপারে হাদীসে এমনটিই বর্ণিত হয়েছে।

তিন. বিপুল সওয়াবের অধিকারী হওয়া। কারণ, দাওয়াতগ্রহীতা যে-পরিমাণ নেক আমল করবে দা'ঈ নিজেও সে-পরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে—

❝

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا

কেউ যদি অপরকে সুন্নাতে হাসানার দিকে দাওয়াত দেয় এবং সে এই দাওয়াত কবুল করে তবে দা'ঈ দাওয়াতগ্রহীতার সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে। এতে দাওয়াতগ্রহীতার সাওয়াব মোটেও হ্রাস পাবে না।[১]

চার. দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে দা'ঈ গ্রহীতার স্তর থেকে দাতার উচ্চতায় উন্নীত হয়। ফলে সে অন্যের ওপর ভালো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে এবং অন্যের কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারে।

পাঁচ. মানুষের মাঝে ইমাম ও অনুসরণীয় ব্যক্তি হওয়ার মর্যাদা লাভ করা। কুরআনে কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সালেহীনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন, তারা তাদের প্রার্থনায় নিবেদন করে—

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ৪৮৩৭

আর আপনি আমাদের মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দিন।[১]

রামাদানে দা'ঈদের দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ অনেক বেড়ে যায়। তাদের কথা বলার অনেক ক্ষেত্র তৈরি হয়। মানুষের দিল নরম থাকে। ভালো কথা শোনার প্রতি এবং সুন্দর লেখা পড়ার প্রতি তাদের প্রচণ্ড আগ্রহ থাকে। আছে কি এমন কোনো দা'ঈ—যিনি এই বরকতময় মাসে সৎ কাজের দিকে আহ্বান করবেন? মানুষকে তার ইলম দ্বারা উপকৃত করবেন?

হে আল্লাহ, আপনি আমাদের অধিক পরিমাণে উপকারী ইলম দান করুন। বেশি বেশি নেক কাজ করার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের সহীহ দ্বীনের বুঝ দান করুন।

[১] সূরা ফুরকান, আয়াত : ৭৪

সিয়াম পালনকারীর দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না

সহীহ হাদীসে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

❝

إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ

সিয়াম পালনকারীর দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।[১]

এর কারণ কী? কারণ, সিয়াম পালনকারীর হৃদয় থাকে ভগ্ন। তার মন থাকে নরম। সে তার মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আহার-বিহার বর্জন করেছে। আসমান-যমীনের প্রতিপালকের ভয়ে কামনা-বাসনা ত্যাগ করেছে। ফলে সে আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলার নৈকট্যলাভে ধন্য হয়েছে।

নুমান ইবনু বাশির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন—

❝

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

দুআই হলো ইবাদাত।[২]

---

[১] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৭৫৩

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ১৪৭৯; *জামি তিরমিযী* : ৩৩৭২

অতএব, যদি কোথাও দেখা যায়, কোনো বান্দা কাকুতি-মিনতি করে দুআ করছে তাহলে বুঝতে হবে, সে আল্লাহর নৈকট্যলাভের প্রয়াসী এবং তার প্রতি চূড়ান্ত আস্থা স্থাপনকারী।

একদা সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের রব কি আমাদের নিকটে যে, আমরা তাকে গোপনে ডাকবো, না তিনি আমাদের থেকে দূরে যে, আমরা তাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকবো? তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন—

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

(হে নবী,) আমার বান্দাগণ যখন তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তখন (তুমি তাদের বলো যে,) আমি এত নিকটবর্তী যে, কেউ যখন আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি। সুতরাং, তারাও আমার কথা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করুক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে এসে যায়।[১]

আবু মুসা আশাআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন—

"

إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا ، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ

তোমরা কোনো বধির বা দূরবর্তী সত্তাকে ডেকো না; বরং তোমরা এমন সত্তাকে ডাকো—যিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদর্শী। তিনি তো তোমাদের উষ্ট্রীর গলার চেয়েও নিকটবর্তী।[২]

দুআ হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে এক নিবিড় সম্পর্কের শক্ত বন্ধন। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন—

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৬

[২] *সহীহ বুখারী* : ৬০২১; *সুনানু বায়হাকী* : ৩৯৩

“

فإنه لا يَهْلِكُ مع الدعاءِ أَحَدٌ

যে দুআ করে সে কিছুতেই ধ্বংস হয় না।[১]

আল্লাহ তাআলা আমাদের দুআ করার প্রতি আহ্বান করেন। তিনি চান আমরা যেন তার কাছে প্রার্থনা করি। কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

তোমরা বিনীতভাবে ও চুপিসারে নিজেদের প্রতিপালককে ডাকো। নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।[২]

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে—

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের দুআ কবুল করব। নিশ্চয় অহংকারবশে যারা আমার ইবাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[৩]

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একটি সহীহ বর্ণনায় এসেছে—

“

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ؟

---

[১] *সহীহ ইবনু হিব্বান* : ৮৭১

[২] সূরা আরাফ, আয়াত : ৫৫

[৩] সূরা গাফির, আয়াত : ৬০

রাসূল ﷺ বলেন, রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আমাদের রব দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং এই বলে ডাকতে থাকেন, আছে কি কোনো প্রার্থনাকারী? আমি তার প্রার্থনা পূরণ করব। আছে কি কোনো আহ্বানকারী? আমি তার আহ্বানে সাড়া দেবো। আছে কি কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।[১]

রামাদান মাস আল্লাহর কাছে চাওয়ার মাস। ক্ষমা প্রার্থনার মাস। দুআ কবুলের মাস। সুতরাং, পিপাসা-কাতর হে সিয়াম পালনকারী, ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্যকারী হে রোজাদার, তুমি তোমার মহান রবের কাছে হাত পাতো। কাকুতি-মিনতি করো। কায়মনোবাক্যে তার কাছে দুআ করো। কারণ, তাঁর দৃষ্টিতে এটা মুমিনের প্রশংসিত গুণ। ঘোষিত হয়েছে—

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

তারা ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করত এবং আমাকে ডাকত—আশায় আশায় ও ভয়ে ভয়ে। আর তারা ছিল আমার প্রতি বিনীত।[২]

দুআর বেশ কিছু আদব রয়েছে। প্রত্যেকেরই তা জানা উচিত এবং দুআ কবুলের স্বার্থেই সেগুলোর প্রতি লক্ষ রাখা উচিত।

দুআর আদবগুলো হচ্ছে—

এক. আল্লাহর দয়া ও দানের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে দুআ করা। সহীহ হাদীসে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন—

لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، فَإِنَّ اللهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ

তোমাদের কেউ যেন এমন না বলে, 'হে আল্লাহ, আপনি যদি চান তাহলে আমাকে ক্ষমা করুন।' বরং চাওয়ার সময় দৃঢ়তার সাথে চাইবে। কারণ, আল্লাহকে বাধ্য করার ক্ষমতা কারও নেই।[৩]

[১] *সহীহ বুখারী* : ১১৪৫; *সহীহ মুসলিম* : ১২৬১

[২] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৯০

[৩] *সহীহ বুখারী* : ৭৪৭৭; *সহীহ মুসলিম* : ২৬৭৯

দুই. দুআর শুরু, শেষ এবং মাঝখানে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ওপর দরূদ পড়া।

তিন. দুআ কবুলের বিশেষ মুহূর্তগুলোতে গুরুত্বসহকারে দুআ করা। যেমন—রাতের শেষ ভাগে দুআ করা। সেজদায় দুআ করা। আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে দুআ করা। ফরয সালাতগুলোর পর দুআ করা। জুমআর দিনের শেষ সময়ে দুআ করা। আসরের পর দুআ করা এবং আরাফার দিন দুআ করা।

চার. দুআর মধ্যে কৃত্রিম ছন্দ ব্যবহার থেকে বিরত থাকা। লৌকিকতা ও সীমালঙ্ঘন থেকে বেঁচে থাকা।

পাঁচ. কোনো গুনাহের কাজের জন্য দুআ না করা। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার জন্য দুআ না করা।

হে সিয়াম পালনকারী, সূর্যাস্তের পূর্বের সময় তোমার জন্য এক মহা নিয়ামত। ইফতারের পূর্বে যখন তোমার ক্ষুধা ও পিপাসা প্রচণ্ড আকার ধারণ করে তখন তুমি আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দুআ করো। কাকুতি-মিনতি করে তোমার রবের কাছে প্রার্থনা করো। সাহরীর গুরুত্বপূর্ণ সময়েও তোমার রবের কাছে প্রার্থনা করো। প্রার্থনা করতেই থাকো। কারণ, তুমি নিঃস্ব, দরিদ্র। তোমার প্রতিপালক ধনী। তুমি দুর্বল। তিনি সর্বশক্তিমান। তুমি মরণশীল। তিনি চিরঞ্জীব।

প্রিয় ভাই, এমন মহান সত্তার কাছে কেন তুমি হাত পাতবে না? তার দরজায় কেন তুমি কড়া নাড়বে না? অথচ সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ মানবেরাও তো তার কাছেই চাইত। তার কাছেই হাত পাতত। দেখো, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কী সুন্দর দুআ করেছেন—

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤٠﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

হে আমার প্রতিপালক, আমাকেও সালাত কায়েমকারী বানিয়ে দিন এবং আমার সন্তানসন্ততির মধ্য থেকেও (এমন লোক সৃষ্টি করুন, যারা সালাত কায়েম করবে)। হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমার দুআ কবুল করে নিন। হে আমার প্রতিপালক, যে-দিন হিসাব প্রতিষ্ঠিত হবে, সে-দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও সকল ঈমানদারদের ক্ষমা করুন।[১]

মুসা আলাইহিস সালাম দুআ করেছেন—

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝

হে আমার প্রতিপালক, আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিন এবং আমার কাজকে সহজ করে দিন।[২]

সুলাইমান আলাইহিস সালাম দুআ করেছেন—

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন, যা আমার পর অন্য কারও হবে না। নিশ্চয় আপনিই তো সবচেয়ে বড় দাতা।[৩]

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ কত চমৎকারভাবে আমাদের রবের কাছে প্রার্থনা করেছেন—

“

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

[১] সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৪০-৪১

[২] সূরা ত-হা, আয়াত : ২৫-২৬

[৩] সূরা সোয়াদ, আয়াত : ৩৫

হে আল্লাহ, হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের রব, হে আসমান-জমিনের স্রষ্টা, আপনার বান্দাদের মধ্যে মতবিরোধের বিষয়গুলোতে আপনিই তো ফায়সালা করবেন। হকের বিষয়ে যে-মতবিরোধ হচ্ছে সে-বিষয়ে আপনি আপনার অনুগ্রহে আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আপনি তো যাকে ইচ্ছা তাকে সঠিক পথ দেখান।[১]

দুআর চারটি উপকারিতা রয়েছে—

এক. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সামনে নিজের দাসত্ব প্রকাশ করা; দুর্বলতা ও অক্ষমতা তুলে ধরা এবং তার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এগুলোই ইবাদাতের প্রাণ ও মূল উদ্দেশ্য।

দুই. দুআ করে সাড়া পাওয়া। হয়তো কোনো কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জিত হবে; নয়তো কোনো অকল্যাণ দূর হবে। আর এর ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই রয়েছে।

তিন. দুনিয়ায় যদি দুআর বাহ্যিক কোনো ফলাফল না-ও পাওয়া যায় তবুও এর সাওয়াব আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত থাকবে এবং পরকালের কঠিন বিপদের সময় তা পাওয়া যাবে। আর এটাই তো অধিক কল্যাণকর। অধিক উপকারী।

চার. দুআর মাধ্যমে মানুষের কাছে চাওয়া-পাওয়ার বিশ্বাস দূর হয়। আল্লাহর সাথে বন্ধন দৃঢ় হয়। তাওহীদ ত্রুটিমুক্ত হয়। সব কিছুকে ত্যাগ করে বান্দা আল্লাহমুখী হয়।

হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন। হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের যে হিদায়াত দান করেছেন তারপর আর আমাদের অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি করবেন না। উপরন্তু আমাদের আপনার একান্ত রহমত দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি অসীম দাতা।
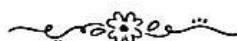
[১] *জামি তিরমিযী* : ৩৪২০

সিয়াম পালনকারীর উপহার

মানুষ তার প্রিয় মানুষকে হাদিয়া দেয়। উপহার প্রদান করে। আমিও আমার প্রিয় সিয়াম পালনকারী ভাই-বোনদের কিছু উপহার দিতে চাই। সিয়াম পালনকারীর জন্য এর চেয়ে বড় উপহার আর কী হতে পারে, যে-উপহার স্বয়ং রাসূল ﷺ প্রতিটি মুসলিমকে দিয়ে গিয়েছেন। কী সেই অমূল্য উপহার?

সেই অমূল্য ও উপকারী উপহার হলো ওই সকল হাদীস—যে-হাদীসগুলোতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বিভিন্ন আমলের প্রতিদানের কথা বলে দিয়েছেন। কখন কী আমল করলে কী পুরস্কার পাওয়া যাবে সেটা উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসগুলোর প্রত্যেকটি দ্বীন-দুনিয়ার সৌভাগ্য ও কল্যাণের রাজতোরণ। নিম্নে এ ধরনের কিছু হাদীস উল্লেখ করা হলো : রাসূল ﷺ বলেছেন—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

যে-ব্যক্তি সকাল বেলা এই দুআ পড়বে—সে-ব্যক্তি ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশের একটা গোলাম আযাদ করার সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে। তার জন্য অতিরিক্ত দশটি নেকী লেখা হবে, দশটি গুনাহ মাফ করা হবে এবং তার মর্যাদা দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে, সে শয়তানের ক্ষতি থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। আর যে-ব্যক্তি সন্ধ্যায় এরূপ বলবে, সে সকাল পর্যন্ত এরূপ সাওয়াব পাবে।[১]

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৫০৭৭, *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৮৬৭

দুই.

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ

যে-ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় এ দুআ পাঠ করবে—সে যদি-ওই দিনে বা রাতে মারা যায়, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১]

তিন.

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

যে-ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় এই দুআটি একশতবার পাঠ করবে—কিয়ামতের দিন তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে আর কেউ উপস্থিত হতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, অন্য কেউ যদি তার চেয়ে বেশি পড়ে তাহলে সে পারবে।[২]

চার.

رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا

যে-ব্যক্তি এই দুআ পড়বে তার জন্য জান্নাত অপরিহার্য হয়ে যাবে।[৩]

পাঁচ.

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

যে-ব্যক্তি এই দুআ পড়বে তার জন্য জান্নাতে একটি বৃক্ষ রোপণ করা হবে।[৪]

---

[১] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৮৭২

[২] *জামি তিরমিযী* : ৩৪৬৮

[৩] *সহীহ ইবনু হিব্বান* : ২৩৬৮

[৪] *জামি তিরমিযী* : ৩৪৬৪

ছয়.

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

যে-ব্যক্তি দিনে একশোবার এই দুআ পাঠ করবে তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়।[১]

সাত.

যে-ব্যক্তি (রাতের সালাতে) দশ আয়াত পরিমাণ পাঠ করবে, সে গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যে-ব্যক্তি রাতে একশত আয়াত তিলাওয়াত করবে, সে অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং যে-ব্যক্তি এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে, তাকে অশেষ সাওয়াবপ্রাপ্তদের তালিকাভুক্ত করা হবে।[২]

আট.

بِسْمِ اللهِ الَّذِى لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

যে-ব্যক্তি সন্ধ্যায় তিনবার এই দুআটি পাঠ করবে সকাল পর্যন্ত তার ওপর কোনো আকস্মিক বিপদ আপতিত হবে না। আর যে-ব্যক্তি সকাল বেলায় তিনবার পড়বে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার ওপর কোনো আকস্মিক বিপদ আপতিত হবে না।[৩]

নয়.

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

যে-ব্যক্তি সন্ধ্যায় এই দুআ পড়বে সেই রাতে সাপের দংশন তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।[৪]

---

[১] সহীহ বুখারী, ৬৪০৫, সহীহ মুসলিম, ২৬৯১

[২] সুনানু আবি দাউদ : ১৩৯৮

[৩] সুনানু আবি দাউদ : ৫০৮৮

[৪] সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৫৭৮

দশ.

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

যে-ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দুআটি পড়ে তবে তাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় 'তুমি যথেষ্ট করেছ, মুক্তি পেয়েছ; শয়তান তোমার থেকে দূরে সরে গেছে।[১]

এগারো.

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا

যে-ব্যক্তি মুআযযিনের আযান শোনার সময় এই দুআ পড়বে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।[২]

বারো.

যে-ব্যক্তি সূরা ইখলাস দশবার পাঠ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।[৩]

তেরো.

যে-ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা কাহফ তিলাওয়াত করবে, তার জন্য দুই জুমআর মধ্যবর্তী কাজ ও সময় আলোকময় করে দেওয়া হবে।[৪]

চৌদ্দ.

যে-ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে জান্নাতে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে তারা একমাত্র বাধা হলো মৃত্যু।[৫]

---

[১] জামি তিরমিযী : ৩৪২৬

[২] সহীহ মুসলিম : ৩৮৬

[৩] মুসনাদ আহমাদ : ১৫৬১০

[৪] মিশকাতুল মাসাবীহ : ২১৭৫; সুনানু বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, ৫৯৯৬

[৫] সুনানুন নাসায়ী : ৯৯২৮

Contents

পনেরো.

যে-ব্যক্তি সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করল সে যেন কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করল।[১]

ষোল.

যে-ব্যক্তি রাতের বেলায় একশত আয়াত তিলাওয়াত করবে সে সারা রাত ইবাদাত করার সাওয়াব পাবে।[২]

এ হলো আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর পক্ষ থেকে একগুচ্ছ উপহার। প্রত্যেক সিয়াম পালনকারীর প্রতি অসামান্য হাদিয়া। হে আল্লাহ, আপনি আপনার যিকির, শোকর এবং উত্তম ইবাদাতের ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা করুন।

---

[১] *জামি তিরমিযী* : ২৮৯৬

[২] *মুসনাদে আহমাদ* : ১৬৯৫৮

আগামীকাল ঈদ

রাত পোহালেই খুশির ঈদ। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর আগামীকাল মুসলিমগণ পুরস্কার গ্রহণ করবে। সকল মুসলিম বিপুল উৎসাহের সাথে এই ঈদ উদযাপন করবে; কিন্তু আমরা ক'জন মুসলিম ঈদের প্রকৃত অর্থের দিকে লক্ষ করি? কীভাবে আমাদের ঈদ সত্যিকারের ঈদ হয়ে উঠতে পারে—সেটাই বা ক'জন জানি?

ঈদ কেবল গান-বাদ্য শ্রবণ কিংবা অর্থহীন আনন্দের নাম নয়; বরং ঈদ মানে করুণাময় মহান রবের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। তার অনুগ্রহ স্বীকার করা এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়া।

ঈদ মানে আল্লাহর নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো। ঈদ মানে শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের ঐক্যশক্তি প্রদর্শন করা।

ঈদের দিনের কয়েকটি আমল—

এক. ঈদুল ফিতরের দিন সকালবেলা সালাতে যাওয়ার পূর্বে খেজুর বা মিষ্টি-জাতীয় কিছু খাওয়া।

দুই. সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা। এর মাধ্যমে সিয়াম পালনকারী অশ্লীল এবং অনর্থক কাজ-কর্ম থেকে পবিত্র হয়। গরিব-দুঃখীরা ঈদের আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ পায়। ধনীদের অন্তর থেকে কার্পণ্য দূর হয় এবং মুসলিমদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিন. সাধ্যমতো বৈধ সাজ-সজ্জা গ্রহণ করা। নতুন এবং সুন্দর পোশাক পরিধান করা। সুগন্ধি ব্যবহার করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন। তাছাড়া এর মাধ্যমে আল্লাহর নেয়ামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। রাসূল ﷺ বলেন—

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে নিয়ামত দান করেন তখন তিনি চান বান্দা যেন তার নেয়ামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।[১]

চার. পরস্পরের প্রতি আন্তরিকতা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করা। সালাম-মুসাফাহা বিনিময় করা। মা-বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদাচার করা। পরিচিতদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করা।

বস্তুত ঈদে মুসলিমদের মাঝে সম্প্রীতি ও ভালোবাসার আশ্চর্য প্রকাশ ঘটে। শরীয়তের গন্ডির মধ্যে থেকেই অনাবিল আনন্দের চিত্র ফুটে ওঠে। এজন্যই তারা হাসি-ঠাট্টা, নির্দোষ রসিকতা, সরস কৌতুক এবং আনন্দ-বিনোদনের মাধ্যমে ঈদ উদযাপন করে।

ঈদের দিন রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব, ছোট-বড়, সুখী-দুঃখী সবার একই কাতারে দাঁড়ানো আমাদের কিয়ামত দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঈদের দিন হলো পুরস্কার প্রদানের দিন। যে-ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় সিয়াম রাখবে সে বিরাট পুরস্কার লাভ করবে। বিপুল সওয়াবের অধিকারী হবে। আর যে সিয়ামে শিথিলতা করবে, আল্লাহর আদেশ অমান্য করবে, পাপাচারে লিপ্ত হবে সে 'হায় আফসোস' করবে এবং অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হবে।

ঈদগাহ থেকে মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে ফেরে। এক দল পুরস্কার নিয়ে ফিরে। আল্লাহ তাদের বলেন, 'তোমরা ফিরে যাও। তোমাদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তোমরা আমাকে সন্তুষ্ট করেছ। আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি।' আরেকদল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা শুধু হতাশা ও আফসোস নিয়ে ফেরে।

---

[১] *জামি তিরমিযী* : ২৮১৯

এক বুযুর্গ ঈদের দিন একদল লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তারা ঈদের আনন্দে মত্ত হয়ে খেল-তামাশায় লিপ্ত ছিল। বুযুর্গ তাদের দেখে বলেন—'তোমরা যদি ভালো আমল করে রামাদান অতিবাহিত করে থাকো তাহলে তো এটা ভালো আমল করতে পারার শোকর নয়। আর যদি খারাপ আমল করে কাটিয়ে থাকো তাহলে রহমানের সাথে মন্দ আচরণ করার পর তো কেউ এমন উল্লাস করতে পারে না।'

উমার ইবনু আবদিল আযীয রাহিমাহুল্লাহু একবার দেখেন, লোকেরা সূর্যাস্তের সময় উট-ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত আরাফাহ থেকে ফিরে যাচ্ছে। তখন তিনি বলেন, 'আজ সে অগ্রগামী নয়, যার উট বা ঘোড়া আগে আগে চলছে। আজ তো সে অগ্রগামী যার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে।'

প্রিয় মুসলিম ভাই, একটু চিন্তা করুন, বিগত ঈদগুলোতে আপনার সাথে আপনার বাবা, দাদা, বন্ধু-বান্ধবসহ কত প্রিয়জন সালাত আদায় করেছে; কিন্তু আজ তারা কোথায়?

হে ভাই, আগামীকাল পুরস্কার গ্রহণের দিন। দুহাত ভরে রবের ভাণ্ডার থেকে চেয়ে নেওয়ার দিন। সুতরাং, আপনি চেষ্টা করুন, আপনার আমলনামায় যেন ভালো কিছু লেখা হয়। আর অপেক্ষা করতে থাকুন সবচেয়ে বড় ঈদের দিনের জন্য। যে-দিন আপনি আপনার রবের সন্তুষ্টি ও ক্ষমা পেয়ে সফলতার শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছে যাবেন, ইন শা আল্লাহ। যে-দিন আপনি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। মহান আল্লাহ বলেন—

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

আর যাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই প্রকৃত অর্থে সফলকাম হবে। আর এই পার্থিবজীবন তো প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়।[১]

হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা। সর্বজ্ঞানী। আপনি আমাদের তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি তাওবা কবুলকারী, চিরদয়াময়।

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৮৫